এছলাম ও বিশ্বনবী

প্রথম খণ্ড

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
ডাক্তার এম, জহুরল হক্

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক—মোহাম্মদ মোবারক আল
মখদুমী লাইব্রেরী.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—মোহাম্মদ আজিজর রহমান
নিউ কলিকাতা প্রেস
৯৩।৩।১নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

সু[illegible] !

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিমত)

খান বাহাদুর মৌলভী আহছান উল্লা সাহেব প্রথম যখন এই বইখানি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে এঁরা আমাদের দুইটি সম্প্রদায়কে এক কর্ত্তে বিশেষ চেষ্টা করেছেন, আর এ রকম বই বাঙ্গালা সাহিত্যে বোধ হয় আর নেই?" তাঁর এই কথা শুনে আমার বড়ই আনন্দ হলো। তারপর টাইটেল পেজ খুলে দেখলুম লেখক একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান, তখন আমার সমস্ত শরীরে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। আমি বল্লুম এইত আমি চাই, আমার সমস্ত জীবনে আমি এই চেয়েছি, আর আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি এই চাইব। একই দেশ, এক জল মাটির উপর জন্ম, এক আবহাওয়ার মধ্যে পালিত ও বর্দ্ধিত, এক পল্লীতে প্রতিবেশী হিসাবে বহুদিন হতে বাস করেও এখনও পর্য্যন্ত এক হতে পাল্লে না। সকাল বেলা বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে যার মুখ দেখতে হয়, তার মত আপনার জন আর কে আছে? কত দিন এই কথাটা ভেবেছি যা এই বই পড়ে, আমি আজ দেখতে পেলুম; তোমরা যদি গীতা খানা আর কোরআন খানি ভাল করে পড়ে দেখ, ভাল করে বুঝে দেখ, তা'হলে আর কি কোন গোল, কোন বাদ-বিসম্বাদ থাকতে পারে? আমি প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্ কি দু'জন হতে পারে, ঈশ্বর কখন কি দু'জন হয়? তা যদি না হয়, তবে তোমাদের মধ্যে এত ভেদ কেন, এই দু'ই দুই ভাব কেন, কেন এত গোলোযোগ, এত বেড়াবেড়ি দিয়ে ভাগ করে এত

ঝগড়া বিবাদ কর্ব্বার কি দরকার? লেখক একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান, বেশ দেখিয়েছেন কোরআন আর গীতা মিলিয়ে ঠিক দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য নেই, কিছুই তফাৎ নেই, আমাদের তফাৎ করে রেখেছে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, আর যারা ভণ্ডামীতে পূর্ণ, যারা ধর্ম্ম কি, মনুষ্যত্ব কি কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, সেই সব সঙ্কীর্ণচিত্ত ধর্ম্মান্ধগণ আমাদের এই অধঃপতনের কারণ। সঙ্কীর্ণতার আগুনে দেশটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না। হজরত মহম্মদ কে? সেই মহামানব মহম্মদের কি বিরাটত্যাগ, কি অসাধারণ সহিষ্ণুতা, আর তাঁর কি শিক্ষা, আর সকলের উপর মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, পড়ে দেখলে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সকলেরই মাথা নীচু হয়ে পড়বে। মানুষের জন্য, মানুষের প্রাণে ধর্ম্মভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য, মানুষকে মানুষ কর্ব্বার জন্য, সেই মহাপুরুষ কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন, কত ঝড়ঝাপটা সহ্য করেছেন. তা না হলে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মানব কখনও বলতেন না—"I strictly follow the foot-prints of your great Nabi.

অনেক বিষয়, অনেক পুরাতন কথা, পুরাতন তথ্য এই বইয়ে প্রকাশ হয়েছে। সাতশ বছর ধরে মুসলমান রাজা আমাদের এই দেশে রাজত্ব করেছেন, তাঁরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁদের কি প্রকার শাসন-প্রণালী ছিল, তাঁদের রাজত্বে প্রজা সকল কি ভাবে বাস কর্ত্ত, সব বিষয় অতি সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে। তখন এত হিংসা, দ্বেষ ছিল না, এত ঝগড়া-বিবাদ, এত মারামারি কাটাকাটি কিছুই ছিল না, তখন আমাদের এই দেশই পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে ধনে, মানে, ঐশ্বর্য্য-সম্পদে, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে সব রকমেই বড় ছিল, পৃথিবীর লোক তখন এই ভারতের উপমা দিত। বাদশাকে সচরাচর লোকে দেখতে পেত না, কিন্তু তাঁদের সুশাসনে সকল প্রজাই সুখে ছিল, সে জন্য সকলেই

বাদশাকে ভাল বাসত, তাঁর জয় কামনা কর্ত্ত। তখন communal riot (সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্বাদ) অভিধানে খুজে পাওয়া যেত না, বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এ বিষয় উল্লেখ কর্ত্তেও সাহস করেননি, যদিও তাঁদের কাল্পনিক চিত্রে মুসলমান রাজাদের কলুষিত চিত্র ইতিহাসের পাতায় অনেক জায়গায় আঁকা রয়েছে। সেই সব অপরিচিত বণিক্‌গণ এদেশের লোকের আচার-ব্যবহার দেখে তাদের সুসভ্য বলতে একটুও কুণ্ঠিত হয় নি, তখন এদেশের কুটীর শিল্পের বাহার দেখে সেই সব বণিক্‌গণ অবাক্ হয়ে থাকতো, এমন কি যন্ত্র-শিল্পে, কি বয়ন-শিল্পে ম্যাঞ্চেষ্টার কি কেণ্ট হার মেনে যেত। তখন কোন লোক অসুখী ছিল না, কোন লোক পেটের অন্নের জন্য হাহাকার কর্ত্তো না। তখন পয়সার অভাবে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় চাকরির জন্য এত উমেদারী কর্ত্ত না।

সব চেয়ে বড় ইসলামের উদারতা, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। ইসলামের বিশেষত্ব ইসলাম ধর্ম্মোপাসকগণ সকলকেই সধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী সকল মানুষকেই ভালবাসতে আদিষ্ট, কারণ সকলেই সেই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, ইসলাম ধর্ম্মের অনুশাসনে প্রত্যেক মানব মুসলমানের প্রীতির ভালবাসার পাত্র, কোন মানুষই মুসলমানের ঘৃণার পাত্র নয়। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম্ম—লাঠির কি হিংসার ধর্ম্ম নয়, আর মহামানব মহম্মদ যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই পুস্তকে যথেষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা সে সমস্ত বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটা বানের মত সমস্ত দেশটাকে ইসলামের শান্তির স্রোতে ভাসিয়ে দিতে, হিংসা-দ্বেষ ভুলে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করে বাস কর্ত্তে লেখকদ্বয় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে দেশসেবা, জনসেবা মানুষের যে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, তার ভাব ও ভাষা অতি সুন্দর। আমার মনে হয় আমাদের এই দু'টো জাতের মিলনের যে পথ এই পুস্তকে দেখান হয়েছে, এর চেয়ে ভাল পথ আর নেই।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এই বইয়ের আগাগোড়া প্রুফ দেখে দিয়েছেন, জানতে পেরে তাঁর উপর আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলুম। আমি জানি তাঁর মনে দুই দুই নেই, তাঁর প্রাণ যেমনি সরল, তেমনি উদার। তাঁর চোখে কি হিন্দু কি মুসলমান সব সমান।

এই বইখানির বহুল প্রচার বিশেষ আবশ্যক। শুধু বাঙ্গালা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমি কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই এই বইখানি পড়ে দেখবার জন্য বিশেষ অনুরোধ কচ্ছি।

Science College, Calcutta.
7th September.

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

নিবেদন

বিশ্বনিয়ন্তা করুণাময় আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় **এছলাম ও বিশ্বনবী** প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এ যেন ভুবনমঙ্গল মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণা, নচেৎ এত অল্প সময় মধ্যে এই গ্রন্থ কখন শেষ হইত না, তাঁহারই মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অনেকের ধারণা এছলাম হিংসার পক্ষপাতী, অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিতে মুছলমান অভ্যস্ত, স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে এছলামধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা; তাঁহাদের এই সব ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া আমাদের এই দেশে এছলামের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে, এছলামের মধুর সৌন্দর্য্য মানব সাধারণের চক্ষে প্রস্ফুটিত করিতে, এছলামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে আকর্ষণ করিতে আমাদের এই প্রয়াস, এই পরিশ্রম। মহান্ আল্লহ্‌র একত্ববাদ (Unity of God) ও মানবের বিশ্বজনীনত্ব (Universal brotherhood) সকল ধর্ম্মের মূল নীতি, এই নীতি অনুসরণ করিয়া সমাজের বক্ষ হইতে হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিবাদ সমস্ত দূর করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের একমাত্র কামনা। সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভু মানবের সকল কার্য্যের সিদ্ধিপ্রদাতা, তাঁহার করুণায় আমাদের আশা ফলবতী হইলে আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন মহান্ আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রছুল, মানবের চিরকল্যাণকামী মহাপ্রাণ মোহাম্মদ

(দঃ) মানবের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা সাধনোপযোগী যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কত সুন্দর, কত সরল, বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি মানব-হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে তিনি যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অনুরূপ শিক্ষক বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির ভিতর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, ত্যাগে ও সহিষ্ণুতায়, অধ্যবসায় ও তিতিক্ষায় জগতে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই মরধামে তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। এই গ্রন্থ ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করিলে পাঠকগণ তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পবিত্র কোরআনের যে সমস্ত শ্লোক আমরা অনুবাদ করিয়াছি, তাহা অনেক স্থলে নির্ভুল না হইলেও ভাবের সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভাষান্তরিত করিতে শব্দানুযায়ী অনুবাদ করিলে ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা কঠিন; বিশেষতঃ আরবী ভাষার প্রতিশব্দ বঙ্গভাষার অভিধানে অনেকস্থলে দৃষ্ট হইবে না। এ জন্য যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে, আমরা সে জন্য আমাদের সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। পাপের পথ হইতে, অধর্ম্মের পথ হইতে, অজ্ঞানতার পথ হইতে, হিংসার পথ হইতে মানবকে নিবৃত্ত করিতে হজরত রছুলুল্লাহ অনেক স্থলে উপমা অনুপ্রাস, উদাহরণ, প্রতিকৃতি (Vision) প্রভৃতি ভাষার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া মানবকে সত্যের পথে আকৃষ্ট করিয়াছেন। (পণ্ডিত-প্রবর খাজা কামাল উদ্দিনের গ্রন্থ রাজিতে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে।) আমরাও এই গ্রন্থে দুই এক স্থানে সেইরূপ প্রতিকৃতি (Vision) ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছি। এ জন্য কেহ যেন না মনে করেন আমাদের পরম প্রেমাস্পদ ও ঐকান্তিক ভক্তির পাত্র মহাপ্রাণ মহানবীর আদেশ অবহেলা করিয়াছি। তাঁহার

অমূল্য উপদেশ পালন করিয়া এবং তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমরা যেন ধন্য হই। আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা যেন মুক্তপ্রাণে তাঁহার জয়গান গাহিতে পারি। পবিত্র কোর-আনের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি অজ্ঞানতা বশতঃ যদি কোন ভুল, ত্রুটি থাকে, আমাদের সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাহা সংশোধন করিব।

বন্ধু-প্রবর মোহাম্মদ মোবারক আলী সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আশা করি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড সত্বরই প্রকাশিত হইবে, এজন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বসিরহাট
২৭শে শ্রাবণ ১৩৪০

বিনীত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ এম, জহুরল হক

কৃতজ্ঞতা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয়ের নিকট আমরা কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া তিনি এই পুস্তকের সমস্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমি প্রথম যখন অধ্যাপক মহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করি, প্রথম আলাপনেই তিনি বলিয়াছিলেন "আমিও হজরত মোহাম্মদের একজন ভক্ত।" আমি সেই মুহূর্ত্তেই আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, মনের নয়নে তাঁহার হৃদয় মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম তাহা শরত চন্দ্রের মত শুভ্র, নির্ম্মল, কলঙ্কলেশহীন। দেশের এই দুর্দ্দিনে, এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দিনে এই মহানুভব মহাত্মার অনুকরণে হিন্দুগণ যদি মুছলমানকে এইরূপ ভালবাসার চক্ষে দেখেন, যদি মনে করেন মুছলমান অস্পৃশ্য নয়, ঘৃণ্য নয়, মুছলমান তাঁহাদের প্রতিবাসী, তাঁহাদের ভ্রাতৃসম স্নেহের পাত্র, তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে পারি যে মুছলমানের মধ্যে এমন কেহ নাই যে এরূপ উদারহৃদয় মহাপ্রাণের করকমলে তাহার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হইবে। করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা তিনি মুছলমানের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

বসিরহাট
২৭শে শ্রাবণ ১৩৪০

বিনীত
ডাঃ এম, জহুরল হক

উৎসর্গ

এছলামের মাহাত্ম্য, এছলামের সৌন্দর্য্য বিকসিত
করিয়া এছলামের শান্তি অব্যাহত রাখিতে
আমাদের এছলাম ও বিশ্বনবী
বাঙ্গলার প্রত্যেক নর-নারীর
হস্তে সাদরে অর্পিত
হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আরবী বর্ণমালায় এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহাদের উচ্চারণ 'ছ' দ্বারা হইলে কোন ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতে পারে না; কিন্তু অনেকে সেই অক্ষরগুলি 'স' দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অনেকে 'স' কে 'ছ' ন্যায় উচ্চারণ না করিয়া 'শ' উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত, সেইজন্য অনেক আরবী শব্দ উচ্চারণে ত্রুটি জন্মে এবং সেই সকল শব্দের কোন বিশেষত্ব থাকে না। যেমন 'এসলাম,' 'মুসলেম' প্রভৃতি শব্দকে 'এশলাম,' 'মুশলেম' উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। এই সকল ভ্রম দূর করিবার জন্য এবং শব্দ উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য আমরা এই গ্রন্থে 'স' স্থানে 'ছ' লিখিলাম।

মুছলেম পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বিনীত নিবেদন ঃ—

১। 'ছৈয়াদে মোরছালিন, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নাম শ্রবণ বা পাঠমাত্রে বলিবেন "ছাল্লাল্লাহো আ'লায়হে অ ছাল্লাম্— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশীর্ব্বাদ ও শান্তি তাঁহার উপর বর্ষিত হউক।

২। হজরতের সহচরগণের নাম উচ্চারণে বলিবেন "রাদ্বিয়াল্লাহো আন্‌হুম—অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন।

৩। মুছলেম-কুল-জননী হজরত খোদেজা, হজরত আয়শা ছিদ্দিকা, হজরত ফাতেমাতুজ্ জোহ্‌রাহ প্রভৃতি রমণী-কুল-শ্রেষ্ঠাদিগের নামোচ্চারণে বলিবেন "রাদ্বিয়াল্লাহোআন্‌হা"—অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হউন।

বিনীত

জহুরল হক্

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

এছলাম ও বিশ্বনবী

প্রথম খণ্ড

উপক্রমণিকা

এই মর-জগতে আল্লাহ্ তায়ালাই একমাত্র প্রশংসার পাত্র, তিনিই মানবকে আশরাফুল মখলুকাত (১) অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারই রহমানিয়াতের (২) উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া মানব কর্ম্ম-জগতে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে। স্বর্গ হইতে অবিরত শান্তির ধারা বর্ষিত হইতেছে,—হে মানব, এছলামের বিধি প্রতিপালন করিয়া সেই স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত হও, তোমার প্রাণের সমস্ত সন্তাপ দূর হইবে। এছলাম সত্য, এছলাম পূর্ণ মঙ্গল, এছলাম শান্তির একমাত্র পথ। (৩)

---

(১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। (২) অনন্ত করুণা।

(৩) এছলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ—আল্লাহ্‌র নামে আত্ম-বিসর্জ্জন এবং তাঁহার বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিয়া জীব সেবায় আত্মনিয়োগ। মানব জীবনে ইহার অপেক্ষা শান্তির প্রশস্ত পথ আর নাই। এছলামের উপাসনা প্রণালীতে এ বিষয় বিশেষরূপ প্রমাণিত হইয়াছে।

স্বভাব ধর্ম্ম

মানবের স্বভাব ধর্ম্ম—এছলাম

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী—মানব। মানবের মানবত্বের পূর্ণতা লাভের একমাত্র আদর্শ এছলামই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে এছলাম, ইহা কোরআনে স্বয়ং মহাপ্রভু জলদ-গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

এই নির্ম্মল কলঙ্ক-লেশহীন পবিত্র ধর্ম্মের জন্য স্বীয় আত্মা মন প্রাণ উৎসর্গ কর; ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের উপর মানবের সমস্ত কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। (১) প্রভুর সৃষ্টির পরিবর্ত্তন নাই, ইহাই জগতে মহান্ সত্য ধর্ম্ম, ইহা না বুঝিয়া মানব নিত্য তাহার অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। ৩০ : ৩০

ধরণীর বক্ষে এছলাম প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম। বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ধরাবক্ষে এমন সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যাহা সম্যক্ প্রকারে পালন করিলে মানব তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-সাধনোপযোগী সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। আকাশ পর্জ্জণ্যরূপে বারি বর্ষণ করিতেছে, ধরিত্রী শস্যসম্ভারে আমাদের সমস্ত খাদ্য বিতরণ করিতেছে, তেমনি তাঁহারই প্রেরিত মহামানব তাঁহারই মঙ্গল বাণী প্রচারিত করিয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের সমস্ত উপাদান—অর্থাৎ আত্মার পরিপুষ্টি সাধনোপযোগী সমস্ত খাদ্য আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। এই আত্মার কল্যাণ সাধনোপযোগী উপাদান—অর্থাৎ খাদ্য সেই পরম মঙ্গলময়ের "ওহি" অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বাণী।

---

(১) এছলামের উদারতা প্রকৃতই অতুলনীয়। মুছলমানের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় নাই, এক আল্লাহ্, এক মানব, এক জাতি, এক পরিবার ভুক্ত। ধর্ম্মের অনুশাসনে প্রত্যেক মানব মুছলমানের আত্মীয়, প্রত্যেকই তাহার প্রেম ও প্রীতির পাত্র। সকল মানব যখন এক, তখন কেহই তাঁহার চক্ষে ঘৃণিত হইতে পারে না। যে কেহ একেশ্বর-বাদী, সৎকর্ম্মশীল এবং পরকাল বিশ্বাসী, তিনিই আল্লাহর নিকট পুরস্কৃত হইবেন। ইহাই এছলামের উদারতা। এছলামের উপাসনা প্রণালীতে এ বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সমগ্র কোরআন এই প্রত্যাদেশ বাণীতে পূর্ণ। ইহা হজরত মোহাম্মদের কিম্বা অন্য কোন মানবের কল্পনা কি মস্তিষ্ক প্রসূত নহে। প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ—

আল্লাহ্ সাধারণ মানবের সহিত বাক্য বিনিময় করেন না, কিন্তু তাহাদের মনোবৃত্তি বিকসিত করিয়া, কি কোন বস্তুর অন্তরাল হইতে কিম্বা তাহারই অনুমতি প্রাপ্ত স্বর্গীয় দূতের দ্বারা। তাহার প্রেরিত স্বর্গীয় দূতের সহিত মহামানব ভিন্ন অপর কাহারও বাক্য বিনিময় হইতে পারে না। সাধারণ মনুষ্যগণ স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মঙ্গল বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কিম্বা কখন কখন বিস্মৃতির আবরণে আত্মগোপন করিয়া মানব তাহার মুখ হইতে ঐশী বাণী নির্গত করিয়া থাকে।

হে মোহাম্মদ, আমি স্বয়ং আল্লাহ্, জীবের মঙ্গলার্থে তোমাকে ঐশী ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া এই পরম পবিত্র সর্ব্বমঙ্গলময় মহা ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রেরণ করিতেছি। তুমি এই পবিত্র ধর্ম্মের এবং সর্ব্বমঙ্গলময় মহাগ্রন্থের সম্যক্ তথ্য অবগত ছিলে না, কিন্তু আমি এই পবিত্র গ্রন্থকে এবং পবিত্র ধর্ম্মকে জগতের আলোক স্বরূপ প্রেরণ করিতেছি। এই আলোক দ্বারা আমার অনুরক্ত দাসগণকে আমি সত্য পথে চালিত করি, তুমিও এই মহাসত্য লোক-সমাজে প্রচারিত করিয়া তাহাদিগকে সত্য পথে চালিত করিবে।

ইহাই মহান্ আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট সত্য পথ ; স্বর্গে ও মর্ত্তে যাহা কিছু বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই সমস্ত বিষয় অবগত। ইহাই ধ্রুব সত্য, সমস্ত কার্য্যই তাঁহাতে পর্য্যবসিত হইবে। ৪২ঃ ৫১—৫৩

তোমার সহচর ভ্রমান্ধ হইয়া কখন সত্য পথ ভ্রষ্ট হইবে না। তাঁহার নিজের ইচ্ছায় তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে কোন ঐশী বাণী নির্গত হইবে না। ইহা আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র মানব-সমাজে প্রচারিত হইবার জন্য

তাহারই প্রত্যাদেশ বাণী। সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট তিনিই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই মহাবিক্রমশালীর মঙ্গলেচ্ছায় তিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন. নৈতিক জীবনে তিনিই একমাত্র আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ। ৫৩ঃ ২—৫

ক্রমান্বয়ে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া হজরত মোহাম্মদের নিকট প্রত্যাদেশ বাণী অবতীর্ণ হইল। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী ঐশীবাণীর সমষ্টি পবিত্র কোরআন। সমগ্র ধর্ম্ম-গ্রন্থে একশত চৌদ্দটি ছুরা বা অধ্যায় আছে. ত্রয়োদশ বৎসরে ষষ্ঠ অশীতি সংখ্যক ছুরা মক্কাশরীফে এবং দশ বৎসরে অষ্টবিংশতি ছুরা মদিনা শরীফে প্রেরিত হইয়াছিল। হজরতের জীবদ্দশায় এই সমস্ত ঐশী বাণী উষ্ট্রের অস্থি, খর্জ্জুর পত্র, হরিণের চর্ম্ম প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল : কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই এই দুর্লভ পদার্থ তাঁহাদের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে শক্তিধর সমস্ত কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারেন, তিনি হাফেজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত। এক একটা ভাগের নাম ছিপারা। এক একটি ছিপারা পুনর্বিভক্ত হইয়া ছুরা নামে অভিহিত হইয়াছে। সমুদয় গ্রন্থে ত্রিশটি ছিপারা, ১১৪টি অধ্যায়, ৬৬৬৬ আয়াত (শ্লোক), ৭৭১৩৯ বাক্য, ৩২৩০১৫ অক্ষর সন্নিবিষ্ট আছে. এক সহস্র আয়াত আদেশ, এক সহস্র আয়াত নিষেধ, এক সহস্র আয়াত শপথ, এক সহস্র আয়াত ভীতি প্রদর্শক, এক সহস্র আয়াত উপদেশ এক সহস্র আয়াত জ্ঞানগর্ভ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পাঁচশত আয়াত যুক্তিপূর্ণ তর্কের ধারা, এক শত আয়াত সেই মহা মহিমান্বিত মহান্ আল্লাহ্‌র স্তব স্তুতি এবং ৬৬টি আয়াত মুখবন্ধ বা ভূমিকা স্বরূপ।

এই পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক মহানবীর জীবদ্দশায় সেই মহান্ আল্লাহ্‌র

ইচ্ছায় একত্রে সংগৃহীত হইয়া অধ্যায় অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া তাঁহার ভক্ত-বৃন্দের পাঠোপযোগী করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পবিত্র পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে "ইহা একত্রে সংগৃহীত করার এবং আবৃত্তি করার দায়িত্ব ভার আমাদের উপর অর্পিত হইয়াছে।" ৭৫: ১৭

এছলামের বিশ্ব-জনিনত্ব

'(আমরা তোমার নিকট (কোরআন) প্রেরণ করি নাই (কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য) বরং মানব সাধারণের জন্য ইহা প্রেরিত হইয়াছে। তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এবং সুসংবাদের অগ্রদূত স্বরূপ।' ৩৪ঃ ১২৮

করুণার নিদান-ভূত এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ২১ঃ ১০৮

(এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে সতর্ককারী আবির্ভূত না হইয়াছে। ফাতের ২৪)

(এবং প্রত্যেক জাতির ভিতর হাদী বা পথ প্রদর্শক আবির্ভূত হইয়াছে। ছুরা আদ ৭)

(প্রকৃত মোমেন বা বিশ্বাসী তাহারা, যাহারা (হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতি যে বাণী সমাগত হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব্বে যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। বকরা ৩)

বিশ্বস্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি মানব, তাঁহাকে আমরা যে নামে অভিহিত করিনা কেন, তিনি এক এবং তাঁহার দ্বিতীয় নাই। মুসলমান ও খৃষ্টানগণ তাঁহাকে আদম এবং হিন্দুগণ তাঁহাকে মনু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই আদি পুরুষের নামকরণে মানুষ আদম হইতে আদমী ও মনু হইতে মানব নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রথম পুরুষ প্রত্যাদেশ বাণীর সাহায্যে মানবদিগকে তৎকালোপযোগী আধ্যাত্মিকতার উপকরণসমূহ দান করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তৎকালীন ঐশী ধর্ম্ম।

ঐশী বাণী কোরআন—পবিত্র কোরআন কার-য়া (অধি-ই-য়াব) ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রত্যেক মানবের অধ্যয়ন করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। এই বিরাট গ্রন্থে মানবের রচিত কিংবা কল্পনা-প্রসূত একটি বাক্যও নাই। সমস্তই সেই মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী। ইহাতে যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে পবিত্র কোরআনে স্বয়ং প্রভু তাঁহাকে জলদ-গম্ভীরস্বরে আহ্বান করিতেছেন।

(আমার সেবক (হজরত মোহাম্মদকে) যাহা আমি প্রেরণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে তোমাদিগের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তদনুরূপ কোন ছুরা রচনা করিয়া জগত সমীপে উপস্থিত কর; যদি তোমাদের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে চাও, তাহা হইলে সেই মহান্ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের যে কোন সাহায্যকারী আছে, তাহার সাহায্যে তদনুরূপ একটি ছুরা রচনা কর।

অতঃপর যদি তোমরা এইরূপ করিতে অকৃতকার্য্য হও, এবং নিশ্চয়ই তোমরা অকৃতকার্য্য হইবে, তাহা হইলে সেই অগ্নিকে ভয় কর, যাহার ইন্ধন মানব ও প্রস্তর। মনে রাখিবে সেই অগ্নি ধর্ম্ম বিদ্বেষী কাফেরগণের নিমিত্ত চির প্রজ্বলিত। ২ঃ ২৩, ২৪)

হে মোহাম্মদ, মনুষ্য সমাজে প্রচারিত কর, যদি সমুদয় জিন ও মনুষ্য একত্রিত হয়, এবং একে অন্যকে সাহায্য করে, তাহা হইলেও কোরআনের অনুরূপ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কেহই সক্ষম হইবে না। ১৭ঃ ৮৮)

(অথবা তাহারা কি বলিয়া থাকে, তিনি ইহা জাল করিয়াছেন? (তবে তাহাদিগকে) বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে ইহার অনুরূপ একটি মাত্র ছুরা প্রণয়ন কর, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা আহ্বান কর। ১০ঃ ৩৮)

এই প্রকার আহ্বান বা দাবী পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে পরিদৃষ্ট হইবে।

এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের পদ বিন্যাস এবং রচনা কৌশল এরূপ চিত্তাকর্ষক যে একজন নিরক্ষর মানবের মুখ হইতে তাহা অনর্গল নির্গত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অলৌকিক ব্যাপার, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বহু আয়াতে দর্পের সহিত এই প্রকার কথিত হইয়াছে যে পৃথিবীতে এইরূপ ঐশী শক্তি সম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি আছে যে ইহার অনুরূপ একটি আয়াত রচনা করিতে পারে? বাস্তবিক পৃথিবীতে সে সময় পণ্ডিত, কবি, সুলেখক, সুবক্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইত্যাদির কোন অভাব ছিলনা। আরবের তদানীন্তন কবি প্রথিত নামা লোবিদ পৌত্তলিক ছিলেন। একদিন তিনি অকস্মাৎ একটি আয়াত শ্রবণ মাত্র বলিলেন এ প্রকার ভাষা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ বলিতে পারে না। ইহার ভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পবিত্র এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। যে সকল অবিশ্বাসী এই পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি উপহাসজনক কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহার অবমাননা করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে উচিত প্রত্যুত্তর দিয়া চিরদিনের জন্য ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে কোরআন শরীফের ভাষা এইরূপ প্রাঞ্জল এবং ইহার ভাবের সৌন্দর্য্য এরূপ মন মুগ্ধকর যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মর্ম্মগ্রাহী প্রত্যেক মানবকেই চমৎকৃত ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে। কোরআন সৃষ্টির বৈচিত্র্য এই যে ইহার অনুরূপ একটি বাক্যও আজ পর্য্যন্ত কেহই রচনা করিতে সক্ষম হন নাই। আদর্শ মানব হজরত রছুলের সমসাময়িক আরবী সাহিত্যে সুপণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ ঐশী বাণী ভিন্ন কখনও মানবের কল্পনা-প্রসূত নহে এবং ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে এতটুকু বিচলিত হন নাই।

সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের তারতম্য এই বিরাট ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহার অনুরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ আর একখানিও পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই। এই পবিত্র পুস্তকের ছত্রে ছত্রে বিশুদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এরূপ বহুল প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থ জগতে আর একখানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত ভাবগ্রাহী ভিন্ন ইহার স্বরূপ এবং আধ্যাত্মিক ভাব অপর কেহই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। ভক্তি আপ্লুত চিত্তে যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তিনিই সাংসারিক জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া পারলৌকিক জীবনে সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য সুখ ভোগ করিতে পারিবেন। সেই পবিত্র কীর্ত্তি, মানবের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) শিরোপরি তাঁহার প্রাণের প্রভূত করুণার ধারা সহস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল, আর তাহারই ফল স্বরূপ এই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মানবসমাজে প্রেরিত হইয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

পবিত্র কোরআন অতি প্রাকৃতিক—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বস্তুর মধ্যে প্রভেদ সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রাকৃতিক বস্তু আমাদের নেত্রগোচর হইয়া থাকে যথা চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, ফল ফুল ইত্যাদি, তৎসমস্তই আমরা সেই পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ইহাদের প্রকৃতিগত গুণ সকল যদি আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তুতে সেই করুণাময়ের করুণার ধারা অবিরত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া আমাদের সম্যক্ প্রতীতি জন্মে।

নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন প্রকৃতিজাত সমস্ত পদার্থ প্রকৃতির অনতিক্রমনীয় নিয়মাধীনে উদ্ভব হইতেছে। আর ঐ একই নিয়মে উহারা

লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু পবিত্র কোরআনে এবং গীতাতে বিশ্বস্রষ্টা বলিতেছেন "আমিই সকল উৎপত্তির কারণ এবং সমস্তই আমা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই প্রকার জানিয়া জ্ঞানীরা ভাবপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে" (গীতা ১০ : ৮) "তিনিই প্রশংসার পাত্র যিনি হস্ত দ্বারা এই রাজ্য (স্বর্গ ও পৃথিবী রাজ্য) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত পদার্থেই তাঁহার শক্তি অব্যাহত। যিনি মৃত্যু এবং জন্ম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাকেও তিনি পরীক্ষা করিবেন (প্রভব ও প্রলয়, ক্ষয় ও বৃদ্ধি তাঁহারই ইচ্ছায় সাধিত হইতেছে) তোমাদিগের মধ্যে কে কর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী এবং তিনি নিত্য ক্ষমাশীল। তিনিই সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখ, (তাহার কার্য্যে) কোন প্রকার অব্যবস্থা কি বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হইবে না। অল মুলক ৬৭ ১—৩ ভাব চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই সেই বিশ্বস্রষ্টার করুণার অভিব্যক্তি, সমস্ত পদার্থই জীবের কল্যাণার্থে তাঁহারই নিপুণ হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত। প্রাকৃতিক বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যতা আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে, সেই অপূর্ব্ব শিল্পীর শিল্প-চাতুর্য্যে আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। নিরক্ষর মহামানব প্রকৃতির এই সকল তত্ত্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুধাবন করিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের উদ্ভাবনী শক্তি প্রকটিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। খলিফাদিগের রাজত্ব কালে এই তত্ত্বে সমাহিত চিত্ত বৈজ্ঞানিকগণ এক সময়ে বোগদাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চ্চায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পবিত্র কোরআন মহান্ আল্লাহ্‌র বিরাট দান এবং স্বর্গীয় পদার্থ। স্বর্গীয় ও প্রাকৃতিক পদার্থ একই স্বভাব সম্পন্ন।

প্রাকৃতিক বস্তু নির্ম্মাণ কল্পে মানুষের যেমন কোন শক্তি নাই, তেমনি এই স্বর্গীয় ধর্ম্মগ্রন্থ এমনকি ইহার একটি বাক্য পর্য্যন্ত মানবের রচিত হইতে পারে না।

পবিত্র কোরআন যে স্বর্গের দান এবং করুণাময়ের করুণার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু স্বয়ং আল্লাহ্ মানবদিগের বোধগম্যের জন্য প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতেছেন।

এবং তোমার প্রভু স্বর্গীয় প্রেরণার দ্বারা মধু মক্ষিকাগণকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে পাহাড় ও অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর এবং ফলে, ফুলে, বসিয়া মধু সংগ্রহ করিয়া মধু পান কর ও সর্ব্বদা গুণ গুণ স্বরে আমার মহিমা কীর্ত্তন কর। (ইহাই আল্লাহ্‌র আদেশ) তুমি এই আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ কর। মনে রাখিবে তাঁহারই আদেশে নানাবর্ণের মধু প্রস্তুত হইয়া আমাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করিতেছে। নিশ্চয়ই এই নিদর্শনে অনুধাবনের অনেক কিছু আছে এবং তাহাতেই তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। ১৬ঃ ৬৮, ৬৯

পবিত্র কোরআনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মান্ধ মানবকে জ্ঞানমার্গে চালিত করা। যখন সমস্ত আরবদেশ এমন কি সমস্ত পৃথিবী অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল, সেই সময় বিশ্বপতি তাঁহার ওজঃ ও তেজের অভিব্যক্তি এক অপূর্ব্ব আলোক রেখা দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিলেন। সেই জগত ব্যাপী শক্তির প্রতিভূ সেই আলোক শিখায় সমস্ত জগত, উদ্ভাসিত হইল। এই স্বর্গীয় অলোকই তাঁহার প্রেরিত মহাধর্ম্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন। যেমন সৌর ও চন্দ্রকর লেখা মানবের মঙ্গলার্থে তাঁহারই সৃষ্টি এবং যাহার দীপ্তি মানব-নির্ম্মিত সহস্র বৈদ্যুতিক আলোক অপেক্ষা সমুজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ।

আল্লাহ্ শব্দের বৈশিষ্ট্য, পবিত্র কোরআনের রচনা এবং শব্দ-বিন্যাসের

সৌন্দর্য্য এবং ইহার ভাবের গভীরতা কত অধিক তাহা ইহার দুই একটি শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে সাধারণের বোধগম্য হইবে।

বিশ্বপতিকে মুসলমানগণ আল্লাহ্ এই আরবী শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়া থাকেন। ইহা কোন গৃহীত অথবা রচিত শব্দ নহে, ইহা প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা ভূতলে অবতীর্ণ। ইহার অনুরূপ শব্দ অন্য কোন ভাষায় নাই। ইহার সৌন্দর্য্য এবং মাহাত্ম্য এত অধিক যে স্বয়ং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহ তাহা বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন।

(আল্লাহ্ শব্দের মধ্যে পাঁচটি অক্ষর বর্ত্তমান আছে। যথা আলেফ, লাম, লাম (আলেফের আকার) খাড়া জবর এবং হে। আরবী বর্ণ মালায় যতগুলি অক্ষর আছে, তন্মধ্যে কতকগুলিতে নোক্তা (ফোঁটা বা দাগের চিহ্ন) বিদ্যমান আর কতকগুলিতে নোক্তা বা দাগ নাই। যে সকল অক্ষরে দাগ নাই, তাহাদিগকে বেনোক্তা অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক অক্ষর বলে।)

এক্ষণে অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, বিশ্বপতি আল্লাহ্ যেমন পবিত্র ও কলঙ্কলেশহীন, তেমনি তাঁহার নাম গঠিত করিতে যে কয়টি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারাও সেইরূপ। এই জন্য তাহার অতি পবিত্র নামে কেহ নোক্তাচিনি অর্থাৎ কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে না। পৃথিবীর কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির নামের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট নহে কিংবা পৌত্তলিক আরববাসীরা তাহাদিগের নির্ম্মিত কোন "পুতুল" ঈশ্বরকে এই নামে অভিহিত করে নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা বিদ্যমান থাকিলেও পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানগণ এই অতি পবিত্র আরবী শব্দ আল্লাহ্ উচ্চারণ করিয়া মনে মনে সেই এক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্‌কে অনুভব করিয়া থাকে এবং এই শব্দটির অনুভবে তাহাদিগের যে তৃপ্তি, তাহা বর্ণনাতীত।

আল্লাহ্ যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেইরূপ তাঁহার বিদ্যমানতা এই

শব্দটির প্রত্যেক অক্ষরের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।(এই শব্দের প্রথম আরবী অক্ষর আলেফ্। এই আলেফ্ অক্ষরটি ঐ শব্দ হইতে বাহির করিয়া লইলেও উহার অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কারণ আল্লাহ্ শব্দ হইতে আলেফ্ অক্ষরটি পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট অক্ষর কয়টি আরবী ব্যাকরণ অনুসারে লিল্লাহ্ বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই লিল্লাহ্ শব্দের অর্থও আল্লাহ্। কোরআনে অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে লিল্লাহ্ মাফিস্ ছামাওয়াতে। পুনরায় আল্লাহ্ শব্দ হইতে প্রথম দুইটি অক্ষর যদি বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আল্লাহ্ নামের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কারণ আলেফ্ ও লাম এই দুইটি অক্ষর মূল শব্দ হইতে বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা লাহু উচ্চারিত হয়। এই লাহু শব্দের অর্থও আল্লাহ্। কোরআনে দৃষ্ট হইবে হুয়াল্ লাহুল্লাজি। এই প্রকারে সব কয়টি অক্ষর পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট অক্ষরটি হু উচ্চারিত হইবে, এই হু শব্দের অর্থও আল্লাহ। কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে লা এলাহা ইল্লাহু।)

কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ শব্দটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। এই মহান্ ধর্মগ্রন্থে তিনি বহু নামে আখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহার এক একটি নামের সহিত এক একটি গুণের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। যথা তিনি অল-ওয়াহিদ্ কিম্বা আহাদ (তিনি এক, অদ্বিতীয়) তিনি আক্রাম (দয়ালু), তিনি করীম (বদান্য), তিনি ওয়াদুদ (প্রেমময়), তিনি খালিক (স্রষ্টা) তিনি রজ্জাক (অন্নদাতা), তিনি কুদ্দুস (পবিত্র), তিনি মুহিয়্ (জীবন দাতা) তিনি কাদীর (শক্তিমান) তিনি কবীর (মহান্) তিনি মুহায়মিন (অভিভাবক) তিনি ওয়াকিল (রক্ষক) তিনি সমী (শ্রোতা) তিনি আলীম (জ্ঞাতা) হালিম (সহনশীল) তিনি শহীদ (সাক্ষী) তিনি হাদী (পথ প্রদর্শক) তিনি হাকেম (বিচারক) তিনি

নূর (আলোক) তিনি হাকিম (মহাজ্ঞানী) মুন্তাকিম (প্রতিফল দাতা) তিনি হক (সত্য) তিনি মাতিন (বলশালী)। তাঁহার একোনশত নামের মধ্যে উপরিউক্ত নামগুলি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাঁহার সমস্ত নামগুলি জপ করিতে জপমালা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই অতি পবিত্র আল্লাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ সমস্ত গুণরাশির অধিনায়ক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জগত স্রষ্টা, জগতপাতা ও জগত সংহার কর্ত্তা। এই আল্লাহ্ শব্দের অনুরূপ শব্দ কোন ভাষাতেই দৃষ্ট হইবে না। ইংরাজি শব্দ God, সংস্কৃত কি বাঙ্গলা শব্দ ভগবান অথবা পরমেশ্বর ইহার অনুরূপ শব্দ নহে। প্রত্যেক ভাষাতেই লিঙ্গ ভেদ আছে যথা God Goddess, ভগবান ভগবতী, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী কিন্তু মহান্ আল্লাহ্ ভেদাভেদ রহিত, তিনি এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ, তিনি মহঃ, ওজঃ ও বলরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি কর্ত্তৃশক্তি, করণ শক্তি ও কর্ম্মশক্তি। এই বিশ্বপতির স্বরূপ ধ্যানাতীত, কল্পনাতীত, এবং তাঁহার রূপের অনুভূতিও ভ্রমাত্মক, প্রাকৃতিক জগতে তিনি অসীম অনন্ত, তিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তিনি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি স্রষ্টা, দ্রষ্টা, শ্রোতা এবং বক্তা। তিনি নিত্য করুণাময়, এবং তাঁহার করুণার ধারা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি প্রেমময় এবং সর্ব্বজীবের মানস-ক্ষেত্রে তিনি প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। তিনি স্নেহময় এবং তাঁহার স্নেহের ধারায় সকল প্রাণী অভিষিক্ত হইতেছে। মানবনেত্রের অগোচরে তাঁহার স্থিতি কিন্তু তাঁহার অগোচরে কিছুই নাই। তিনি তাঁহার ভক্তের হৃদয়ের অভিব্যক্তি অথচ তিনি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদির বহির্ভূত।

আল্লাহ্ শব্দের অক্ষরগুলি যেমন পাঁচটি, তেমনি এই সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্মের মূল ভিত্তিও পাঁচটি যথা ঈমান (আল্লাহকে এক এবং

অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস) নমাজ (উপাসনা) রোজা (উপবাস) জাকাত (বাধ্যতা মূলক দান) হজ্জ (ভক্তবৃন্দের মিলনক্ষেত্র মক্কা তীর্থে গমন)। নৈতিক চরিত্র গঠিত করিয়া পারমার্থিক অবস্থায় উন্নত হইবার উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় মানবের অপরিহার্য্য। এছলামের পঞ্চ নমাজের এইরূপ আল্লাহ্ শব্দের পঞ্চ সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

এইরূপ কি আধিভৌতিক কি আধ্যাত্মিক উভয় জগতের বহু তত্ত্বপূর্ণ ও কল্যাণপ্রসূ বিষয়গুলি পাঁচ সংখ্যাভুক্ত, যেরূপ আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্। এই পঞ্চেন্দ্রিয় সেই করুণাময় আল্লাহ্রই দান। সেই প্রকার আমরা আমাদের হস্ত ও পদে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া তাহারই অসীম জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। এইরূপে মঙ্গলময়ের মহাদান সমূহ তাহারই নামের পঞ্চ সংখ্যার সহিত ঐক্য রহিয়াছে।

বস্তুতঃ মোহাম্মদ, ঈমান, এনছান, শরিয়ত ও মারেফত প্রভৃতি ধর্ম্মভাবপূর্ণ পদগুলি আরবি পাঁচ পাঁচ অক্ষরে লিখিত। এই সকল পদগুলির সংখ্যার সহিত আল্লাহ্ শব্দের সংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

বাহ্য জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতে পারমার্থিক অবস্থায় উন্নত শিখরে আরোহণ করিবার পাঁচটি সোপান আছে, তাহাদের আরবি নাম যথা রুহ, কল্‌ব, ছিরর্, খাফি ও আখ্‌ফা। এইগুলি ধর্ম্মগুরুর নিকট শিক্ষণীয় বিষয়।)

এই আল্লাহ্ শব্দের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য কিরূপভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা পবিত্র কোরআনে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র প্রভু এবং দৃঢ়রূপে তাঁহাতেই আকৃষ্ট থাকেন, এবং সত্যপথ অবলম্বন করেন, স্বর্গীয় দূত তাঁহাদের নিকট স্বর্গীয় বাণী লইয়া অবতরণ করেন এবং বলেন ভীত হইও না, বিষণ্ন হইও না, তোমাদের স্বর্গলাভ বিষয়ে তোমরা প্রতিশ্রুতি পাইয়াছ।

আমরা তোমাদের ইহজীবনে এবং তোমাদের পরজীবনে তোমাদের বন্ধু থাকিব, তোমরা তৎসমস্তই পাইবে, যাহা তোমরা পাইতে ইচ্ছা করিয়াছ এবং প্রার্থী হইয়াছ। ৪১ ঃ ৩০—৩১

কত বড় বিশ্বাস! এছলাম ধর্ম্মের মূল নীতি এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। আমার প্রভু, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা, আমার সুখ সম্পদ্, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিবেন, তিনিই পরমানন্দ লাভ করিবেন এবং স্বর্গীয় সুখ ও স্বর্গ অর্থাৎ সেই সুরম্য উদ্যানে অমৃত নিস্যন্দিনী তটিনীতীরে অবস্থিতি করিয়া তাহারই সান্নিধ্য সুখ লাভ করিবেন। হজরত মোহাম্মদ তাঁহার সমস্ত জীবনে তাহার সমস্ত কার্য্যে এই বিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, তাই অমোঘ তাঁহার বাক্য।

সেই বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্ পরম কারুণিক, তাঁহার করুণার নিদর্শন তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থে প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রত্যেক পদার্থই তিনি আমাদিগের জীবন ধারণোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এই করুণার নিদর্শন কোরআনে বর্ণিত তাঁহারই প্রত্যাদেশ বাণীতে প্রকাশ পাইতেছে। আর্ত্ত ও বিপন্নের, ব্যথিত ও পীড়িতের, বিপদগ্রস্তের ও বিষাদগ্রস্তের কাতর আর্ত্তনাদে তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার কখনই সহ্য করিতে পারেন না, এবং অত্যাচার-পীড়িতকে তিনিই রক্ষা করিয়া থাকেন। পবিত্র কোর-আনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

তিনি কে? যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদিগের কল্যাণার্থে তাঁহারই কৃপায় মেঘ হইতে বারি বর্ষিত হইতেছে, এবং তাঁহারই দ্বারায় সুরম্য উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছে। সেই উদ্যানে দ্রুম-লতা ইত্যাদি দৃষ্টি, সুখকর সৃষ্টি কখন কি তোমার দ্বারা সম্ভব হইতে

পারে? এখনও কি তোমার ভ্রম আছে, যে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সমকক্ষ আর কেহ থাকিতে পারে? কিন্তু এখনওত তাহারা সত্যপথ ভ্রষ্ট হইতেছে। সেই প্রভু, যিনি তোমাদিগের বাসস্থানের উপযোগী করিয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে স্রোতস্বিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, উন্নত পর্ব্বত স্থাপিত করিয়াছেন এবং উভয় সমুদ্রের মধ্যস্থলে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সমকক্ষ আর কি কোন ঈশ্বর থাকিতে পারে? কিন্তু অধিকাংশ মানব এখনও অজ্ঞ। সেই প্রভু, তিনি কে—যিনি আর্ত্ত ও বিপন্নদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ এবং তাহাদিগের যন্ত্রণার উপশম করিয়া থাকেন? তিনিই অত্যাচারিগণের অত্যাচার নিবারণ করিয়া অত্যাচার-পীড়িতকে সেই অত্যাচারীর স্থানে বিজয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। ২৭ঃ ৬০—৬২

ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই, এবং ইহার প্রতি ছত্রে ছত্রে এমন কি ইহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে উদারভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ভগবদ্বাক্যে সুপ্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের সমস্ত মানবের সেই মহান্ আল্লাহ্‌কে ডাকিবার সমান অধিকার আছে আর সেই করুণাময় মহাপ্রভু কাহারও পক্ষপাতী নহেন, বিপন্ন হইয়া যে তাঁহাকে ডাকিবে, যে তাঁহার প্রার্থনা করিবে, তিনি তাহারই ডাক শুনিবেন, তাহারই প্রার্থনা পূরণ করিবেন। অজ্ঞ ও ভ্রমান্ধ লোকদিগকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করিতে এছলামের মহান্ উদ্দেশ্য—কোরআনের এই সমস্ত প্রত্যাদেশ বাণীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই সমস্ত কারণে বলিতেছি যে এই মহান্ "আল্লাহ্" শব্দটি এরূপ ভাবোদ্দীপক এবং ইহার রচনা-কৌশল এতই চিত্তাকর্ষক যে ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন ইহা কখনই মনুষ্য-কল্পনা-প্রসূত নহে

কিম্বা কোন যোগী কি সাধুপুরুষের লেখনী-প্রসূত নহে। এই সমস্ত ঐশী-বাণী যে একজন নিরক্ষর মানবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে এই কারণেও তাঁহাদের উক্ত ধারণা আরো বদ্ধমূল হইয়াছে।

মহান্ আল্লাহ্‌র সর্ব্বব্যাপকত্ব, কোর-আনের অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিকৃত ভাব ও সৌন্দর্য্য—হে মানব, সেই মহান্ আল্লাহ্ যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর খালেক্ব (সৃষ্টিকর্ত্তা), যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যাহার অনন্ত করুণা জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, আকাশে, পাতালে, কাননে, কান্তারে, তোমরা তাহারই শরণ লও। তিনি অনাদি, অনন্ত, অব্যয় ও অক্ষর, তিনি সৃজন, পালন ও সংহারকর্ত্তা। মধুকালীন মধুনিস্যন্দী কুসুমচয়ের গন্ধ বহন করিয়া গন্ধবহ প্রবাহিত হইলে, মধুকর যেমন সেই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কুসুমের দিকে প্রধাবিত হয়, হে মানব, তোমরাও সেই সত্য সনাতন সর্ব্বগুণের আকর মহান্ আল্লাহ্‌র গুণ-মধু পান করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হও, আর তাঁহাকে ডাক, ভক্তি-আপ্লুতচিত্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ডাক, প্রাণে তৃপ্তি পাইবে, অন্তরে সুখ পাইবে, হৃদয়ে শান্তি পাইবে। এবং তাঁহার উপর যাহারা (মুছলেম) বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছে এবং সেই সমস্ত ইহুদী, খৃষ্টান কি ছাবেয়িন (নক্ষত্র কি স্বর্গীয় দূতের উপাসক) তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্যে নিরত থাকে, তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট পুরস্কৃত হইবে এবং তাহাদের ভীত, কি বিষাদগ্রস্ত কি সন্তাপিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। ২ : ৬২

তুমি কি ইহা অবগত নহ যে, স্বর্গ ও পৃথিবীরাজ্যের অধিপতি একমাত্র সেই মহান্ আল্লাহ্ এবং তিনি ব্যতীত তোমার আর কোন অভিভাবক কি সাহায্যকারী নাই। ২ : ১০৭

যে কোন সৎকর্ম তুমি করিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে তাঁহারই নিকট প্রেরিত হইবে এবং পরে দেখিতে পাইবে সেই সকল সৎকর্ম্ম তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ সেই মহাপ্রভু সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেছেন তুমি কি করিতেছ! এবং তাহারা বলিয়া থাকে ইহুদী কি খৃষ্টান ব্যতীত আর কেহই সেই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা তাহাদিগের বৃথা বাসনা। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী, তাহা হইলে ইহা প্রমাণ করিয়া দাও। আমি বলিতেছি যে কেহ আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে এবং সৎকর্ম্মে নিরত থাকিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভুর নিকট পুরস্কৃত হইবে আর তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না কিংবা তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে না।

সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সর্ব্বব্যাপকত্ব, তাঁহার নিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পবিত্র কোরআনে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বিশ্বজনীন এছলাম-ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে এছলাম-ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতার চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হইবে না। এইজন্যই আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এছলাম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আর বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনায় মহামানব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রভুর প্রত্যাদেশবাণী জন-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমি বড়, আমি মহৎ, আমার ধর্ম্ম, আমার আল্লাহ্, এই আত্মম্ভরিতা এছলাম জগতে কোথাও দৃষ্ট হইবে না। এছলাম মুক্তকণ্ঠে শিক্ষা দিতেছে হে মানব, তুমি সেই আল্লাহ্‌কে ডাক, বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, শয়নে স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময় ডাক, ভক্তিআপ্লুতচিত্তে ডাক, অন্তরের অন্তস্তল হইতে ডাক, মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ডাক, সেই মহান্ আল্লাহ্ কেবল আমার নয়, কেবল তোমার নয়, তিনি সকলের, তিনি ক্ষুদ্রের, তিনি মহতের, তিনি রাজার, তিনি প্রজার, তিনি দুঃখীর, তিনি

ধনীর, তিনি কাঙ্গালের, তিনি ঐশ্বর্য্যশালীর, যে কেহ তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি তাহারই ডাক শুনিবেন, তাহাকেই পুরস্কৃত করিবেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের সঙ্কীর্ণতার বিবরণ উপরি উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে স্বর্গোদ্যান কেবল তাহাদিগের জন্যই উন্মুক্ত আছে। কিন্তু এছলাম নির্দ্দেশ করিতেছে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশাধিকার তাহারাই প্রাপ্ত হইবে, যাহারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখিবে এবং সৎকর্ম্মে নিরত থাকিবে। যিনি প্রকৃত এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী, পবিত্র কোরআনের ভাব যাঁহার অন্তরে পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনিই উন্মুক্ত বক্ষে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিবেন, এস, তোমরা কে আছ, পাপী-তাপী কে আছ, কে তোমরা অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছ, তৃষিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছ, এস, আমার এই উন্মুক্ত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ কর, এই বক্ষে সেই প্রেমময়ের প্রেমের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, করুণাময়ের করুণা উথলিয়া উঠিতেছে, এস আমার ভাই এস, এস আমার বন্ধু এস, এস আমার প্রিয়, আমার বাঞ্ছিত, আমার আকাঙ্ক্ষিত, এস আমি তোমাকে সেই পরম পবিত্র প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত করিব, তোমার সর্ব্বসন্তাপ দূর হইবে, এস, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইব, তোমার অশান্তির অনল-শিখা নির্ব্বাপিত হইবে।

জগতে যত মধু ছিল, মুছলমানের অন্তরে ঢালিয়া দিয়া মহামানব মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, মুছলমান, সেই মধুর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবী, মধুস্রোতে প্লাবিত কর, সেই মধুস্রোতে ভাসিয়া মানব তাহার অন্তরের হিংসার আগুন নির্ব্বাপিত করুক।

পৃথিবী, বিশেষতঃ আরবদেশ তখন অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ভ্রমান্ধ মানব চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ ইত্যাদি ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিত। সত্যের পথ কণ্টকাবৃত ও

তমসাবৃত ছিল, এমন সময় মহামানব মহামহিমান্বিত মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী প্রচাব করিতে আরবে, আরবে কেন অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন, জ্ঞানের আলোকে ভ্রমান্ধ মানবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, আকাশে, বাতাসে সর্ব্বত্রই সত্যের দুন্দুভি-নিনাদ ঘোষিত হইল।

সত্যের উপর এছলাম প্রতিষ্ঠিত এবং এই সত্যের বাণী, সত্যমঙ্গলময় মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিবাব জন্যই সত্যনিষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম। প্রভু বলিতেছেন আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সত্যাশ্রয়ী হইয়া সুসংবাদ বহন করিতে এবং মানব সকলকে সতর্ক করিতে। ২ঃ ১১৯

(এছলামের ঔদার্য্যে ও মহত্ত্বে বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিশ্বনিয়ন্তা মহাপ্রভু আল্লাহ্ স্বয়ং বলিতেছেন,—

বল, আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি এবং তাঁহাব প্রত্যাদেশবাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি এবং যে প্রত্যাদেশবাণী পূর্ব্বে ইব্রাহিম, ইসমাইল, আইজাক (এছহাক), জেকব (ইয়াকুব) এবং সেই সমস্ত জাতিকে এবং যাহা মুছাকে ও যীশুকে প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই আমবা বিশ্বাস করি এবং তাঁহাদেব সম্বন্ধে আমাদের কোন ভেদ জ্ঞান নাই। ২ঃ ১৩৬)

প্রভুর এই সত্য বাণী দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্ট ও অসূয়াশূন্য এবং সম্মানিত সাধুলোককে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনই কৃপণতা করেন না। এই বাণী দ্বারা এছলামের উদারতা ও সর্ব্বজনীনত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

যে মানব সেই নিখিল লোকাধিপতি মহান্ আল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন এবং যাঁহার হৃদয়-কমলে সেই প্রেমময়ের গুণাবলী, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সত্যবৎ প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কুনীতি হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে যিনি অজ্ঞানতাবশতঃ মন্দকার্য্য করিয়াছেন, তিনি যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি চিত্ত নিবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। ৪ : ১৭

মানব অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সেই সত্য-স্বরূপ মহান্ আল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানী লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সর্পের বিবরে হস্তসঞ্চারিত করে না, সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে না, বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করে না কিংবা অগ্নিশিখায় হস্ত প্রসারিত করিয়া দেয় না। ভ্রমান্ধ মানব সত্যের পথ অন্বেষণ করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হয় না, যে পথে প্রবেশ করিয়া সেই পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র গুণাবলী উপলব্ধি করিয়া সহজে তাঁহাতে লীন হইতে পারে, এছলাম সেই সব ভ্রমান্ধ মানবকে পাপের পথ হইতে মুক্ত করিতে, তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করিতে জগতে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার তুলনা কোথায়? উদ্ধত ভাবাপন্ন মোহগ্রস্ত মানবকে শিক্ষা দিতে পবিত্র কোরআনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতেছে, হে মানব, তোমরা আল্লাহ্‌তে চিত্ত সমর্পণ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অর্থাৎ বিশ্বমানবের সেবাপরায়ণ হইয়া বিশুদ্ধভাবে ফাতেহার স্তোত্র জপ কর, ইহাই এই পৃথিবীতে তোমাদের একমাত্র সম্বল। ইহাই এছলামের বিশেষত্ব।

এছলামে বর্ণিত আল্লাহ্ সর্ব্বপ্রকার অসূয়া ও হিংসা বর্জ্জিত, তিনি নিত্য ক্ষমাশীল এবং তাঁহার করুণার ধারা অপ্রতিহত ও সর্ব্বদা মুক্ত।

সর্ব্বপ্রকার অসৎকর্ম্মও করুণাময় আল্লাহ্ দূরে পরিহার করিয়া মানবের সমস্ত কার্য্যাবলির মধ্যে যাহা সৎ ও উৎকৃষ্ট, তাহার জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। ৩৯ : ৫৩

এত করুণা, এত স্নেহ, এত ভালবাসা। হে প্রভু, তোমার এ করুণার তুলনা নাই, এ স্নেহের সীমা নাই, এ ভালবাসার উপমা নাই। তোমার সেই অপার করুণার ধারায় সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত, তুমি মানবগণকে সেই ধারায় অভিষিক্ত করিতেছ, তাহাদিগের সর্ব্ব-সন্তাপ দূর করিতেছ, তবুও তাহারা তোমার উপর বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে।

মানব যখন বিপদে পতিত হয়, তখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া থাকে এবং তাঁহারই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর তাহার মনে হয় তিনিই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তিনি যখন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন, সে তখন ভুলিয়া যায় কি জন্য সে তাঁহাকে ডাকিয়াছিল। ৩৯ : ৮

মানব এমনি ক্ষুদ্র প্রাণ, এমনি অকৃতজ্ঞ। সাংসারিক জীবনে শিক্ষার জন্য, পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য, প্রভুর এই বিরাট দান,—তাঁহার এই প্রত্যাদেশ বাণী। এইজন্য আমরা বলিতেছি সংসারে সংসারী থাকিয়া মানবকে ধর্ম্মনীতি ও পবিত্র জ্ঞান কি প্রকারে অর্জ্জন করিতে হয়, এই শিক্ষা এছলামে যেমন সরল ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এমনটি আর কোথাও নাই। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে :—

প্রাণিজগতে আমরা মানবকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, অধিক ক্ষমতাশালী ও অধিক বুদ্ধিমান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ৯৫ : ৪

অর্থাৎ জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বিকশিত করিবার সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপাদান আল্লাহ্ মানবকে দান করিয়াছেন।

তাহাদিগের আত্মা যাহা সম্পূর্ণ ও কলঙ্কলেশহীন হইয়া তাহার দ্বারায় সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দ্বারায় তাহারা ন্যায় অন্যায়ের তারতম্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। ৯১ : ৭

এই একটিমাত্র শ্লোক মানব যদি তাহার অন্তরে মুদ্রিত করিতে পারে এবং সর্ব্বদা আলোচনা করে, আর তদনুসারে যদি তাহার কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত জীবনে সে কখনও পাপের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যদি কখন তাহার চিত্ত কলুষিত হইয়া তাহাকে অধর্ম্মের পথে আকৃষ্ট করে, তখনি তাহার পবিত্র স্মৃতি তাহার বিবেকের দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে।

(সেই মহান্ আল্লাহ্র করুণা, তাঁহার স্নেহ, তাঁহার প্রেম, তাঁহার ভালবাসা আর তাঁহার ক্ষমা কত গভীর, কত স্নিগ্ধ, কত পবিত্র, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা মানবের সাধ্যাতীত।

এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—যিনি সৎকর্ম্ম করেন, সৎকর্ম্মে রত থাকেন, করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহার সৎকর্ম্মের দশগুণ পুরস্কার প্রদান করেন, কিন্তু যিনি অসৎ কর্ম্ম করিবেন, করুণাময় তাঁহার অসৎকর্ম্মের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন, অর্থাৎ তিনি তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না। ৬ঃ ১৬১)

তিনি যে মালেক ও রহিম অর্থাৎ করুণাময় বিচারকর্ত্তা, তাঁহার এই সমস্ত প্রত্যাদেশবাণীতে তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে। মানবের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় কখন বিফল হয় না, যিনি যেরূপ পরিশ্রম করিবেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ তাঁহাকে তদনুরূপ ফলপ্রদান করিবেন। ৪ঃ ৯৫

তিনি বলিতেছেন—আমার করুণার আবরণে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আবৃত রহিয়াছে। এ পৃথিবীতে এমন কোন জীব, কি এমন কোন

বস্তু নাই যাহার উপর তাঁহার সকরুণ দৃষ্টি নিপতিত না রহিয়াছে। ভ্রমান্ধ মানব বুঝিতে পারে না যে আমরা প্রতিপদক্ষেপে তাঁহারই দ্বারায় রক্ষিত, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত মানব একপদ অগ্রসর হইতে পারে না, এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতে পারে না। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, জল, বায়ু, অগ্নি, বিবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ সেই মহাশক্তিশালী মহান্ আল্লাহ্ আমাদেরই উপকারার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের জীবনধারণোপযোগী প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার করুণার অভিব্যক্তি। এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করা, তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য।

এছলামের মহান্ উদ্দেশ্য, প্রত্যেক মানবকে—ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, অভিজাত, অনভিজাত প্রত্যেক মানবকে এক সৌভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এবং সুনির্ম্মল শান্তির জলে অভিষিক্ত করিয়া জ্ঞান-মার্গে চালিত করা। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলি মনে মনে আন্দোলন করিয়া এবং তাঁহারই অনুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা যেন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি আমরা তাঁহারই অনুগ্রহে জীবিত, তাঁহারই অনুগ্রহে পালিত এবং তাঁহারই অনুগ্রহে রক্ষিত হইতেছি। প্রত্যেক মানবের হিতোপদেশের এই শ্লোকটি মনে রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

এই ব্যক্তি আমার আপনার, ঐ ব্যক্তি আমার পর, যাহারা লঘচিত্ত, তাহারাই এইরূপ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু উদার চরিত্রের

সমস্ত বসুধার মানবই কুটুম্ব। সেইজন্য বিশ্বের সমস্ত মানবই মুছলমানের আপনার, তাহার ভ্রাতা, তাহার বন্ধু, তাহার আত্মীয়, তাহার কুটুম্ব। এছলামের মধুর সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রকারে আল্লাহ্‌তে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশ্ব মানবকে আপনার করিতে পারিয়াছেন, শান্তি তখন নিঃসন্দেহে তাঁহার অনুগমন করিবে, যেন তাঁহার সখী, তাঁহার জায়া, তাঁহার সহচরী, সমস্ত জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্ছেদ নাই, বিরক্তি নাই। নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিপাতে দেখিতে পাইবেন কি সুন্দর, কি মধুর, কি চিত্তবিনোদনকারী চিত্র এছলাম অঙ্কিত করিয়াছে, যাহার স্থিতি স্বর্গে ও পৃথিবীতে। হে জগদ্বাসিগণ, এছলামের প্রিয় ভক্তগণ, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এই অপূর্ব্ব চিত্র অবলোকন কর। এই চিত্রের চিত্র ফলক মানবের কর্ম্ম, তাহার আধার মানবের হৃদয়। শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত কেমন বিবিধ বর্ণে এই চিত্র অঙ্কিত। ঐ দেখ শুভ্র বেশে ঐ সেই গৌরকান্তি মহাপুরুষ জ্ঞানমার্গের উন্নত শিখর হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া সস্মিত আননে পাপী, তাপী সকলকে আহ্বান করিতেছেন, দেখ তাঁহার হৃদয় হইতে প্রেমের ধারা সহস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় হইতে প্রেম অশ্রু অবিরত বিগলিত হইতেছে, তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া করুণার উৎস প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে। দেখ ঐ সব আর্ত্ত, ব্যথিত, পীড়িত, তৃষিত, কত শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মানব তাহাদের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ব্যথা, তাঁহারই চরণ-কমলে ঢালিয়া দিয়া পরম শান্তিলাভ করিতেছে। দেখ তাঁহার হৃদয় পর্ব্বতের মত উচ্চ, আকাশের মত প্রশস্ত, সমুদ্রের মত গভীর, নির্ঝরিণীর শীকর সলিলের মত স্নিগ্ধ। সেই প্রশস্ত হৃদয়ে স্থান পাইয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মহান্ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট

কত মানব সেই বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমসুধা পান করিয়া তাহাদের সংসারের সমস্ত জ্বালা, সমস্ত সন্তাপ বিস্মৃত হইয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুণ্যকাহিনী সেই মধুনিস্যন্দী পবিত্র মুখ হইতে অনর্গল নির্গত হইয়া পৃথিবীর সমস্ত মানবের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে। সেই পবিত্র মুখের পবিত্র বাণীর পীযূষধারা পান করিয়া তাহাদের আকুল বাসনা ছুটিয়া যাইতেছে, এই মরধামে কি করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করিবে। আবার দেখ, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ, মনের নয়নে নিরীক্ষণ কর, কি সুন্দর ঐ চিত্র, সেই শ্বেত বর্ণ স্বর্ণকান্তি মহাপুরুষ অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তোমাদিগকে দেখাইতেছেন জীবনের পরপারের ঐ প্রাণমন স্নিগ্ধকারী চিত্র, ঐ সেই চিত্র, মন্দার গন্ধামোদিত ঐ সেই নন্দন কানন, কত শত সহস্র বিবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, কুসুমদাম শোভিত, কি মধুর, কি স্নিগ্ধ পরিমল সমীরণে মন্দে মন্দে প্রবাহিত হইতেছে, আর সেই কানন-বক্ষ ভেদ করিয়া কলনাদিনী প্রবাহিনী মৃদু মন্দে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সৈকত ভেদ করিয়া কি সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা, স্নিগ্ধ আলোক রেখায় সমুদ্ভাসিত হর্ম্মতলে বিচিত্র পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা, ঐ দেখ বেহেস্তের এই মনোহর চিত্র সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অঙ্গুলি সঙ্কেতে নির্দ্দেশ করিতেছেন। আবার দেখ অন্তর্দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ প্রলোভনের সহস্র উপাদান সংগ্রহ করিয়া তোমাকে আকৃষ্ট করিতেছে; ঐ দেখ, ঐ সব ভৃগোন্নত স্তনশালিনী আয়তাক্ষী, তাহার উন্নত বক্ষে কামনার সহস্র তরঙ্গ ছুটিয়া যাইতেছে, তাহার ঐ বিলোল অপাঙ্গে কি তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনল প্রজ্বলিত রহিয়াছে, রক্তোৎপল সদৃশ স্ফুরিতাধরের মধুর হাসি তোমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে। দেখ তাহার ঐ

মৃণাল বাহুতে সুধাভাণ্ড, কিন্তু বিবেকের দ্বার মুক্ত করিলে জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইবে তাহার অভ্যন্তরে কি তীব্র হলাহল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আবার দেখ ঐ রক্তবর্ণ পুরুষ হিংসার শাণিত কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়বিধ বিষাক্ত অস্ত্রে তাহার সমস্ত অঙ্গ সুসজ্জিত, হিংসার রক্তে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিতে দেখ তাহার সমস্ত অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিতেছে, ক্রোধরূপ বহ্নিতে এই বিস্তৃত ভূমণ্ডল দগ্ধ করিতে কি তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, মোহের অন্ধকারে তোমার জ্ঞানচক্ষু আবৃত করিতে কি তার আকুল আগ্রহ, মাৎসর্য্যের তীব্র কষাঘাতে তোমার সমস্ত দেহ জর্জ্জরিত করিতে ঐ তার হস্ত উত্তোলিত রহিয়াছে, মদস্রাবী মাতঙ্গগণ ধ্বংসের লীলা প্রদর্শন করিতে তাহার চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু সেই মহাপুরুষ, সেই শ্বেত শুভ্র রজতনিভ পুরুষ-প্রধান উচ্চকণ্ঠে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, হে মানব, ঐ সমস্ত পথে কদাচ পদার্পণ করিও না। এস, এই বেহেস্তের পথ, এই পথে অগ্রসর হও, মহায়নে যাত্রা করিবার পর মহান্ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

এই এছলামের চিত্র। পৃথিবী সৃষ্টির পর হইতে কোন চিত্রকর এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানবের চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারে নাই। পবিত্র কোরআনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই চিত্র প্রতিফলিত। এই চিত্র হৃদয়পটে অঙ্কিত করিলে মানব কখন পাপের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না, বিবেকের তীব্র কষাঘাত তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে, তাহার পর সংসারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া জীবনের পরপারে সেই চিত্রে অঙ্কিত বেহেস্তের রম্য উদ্যানে স্থান প্রাপ্ত হইবে।" যে নিপুণ চিত্রকর এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,

করুণাময় আল্লাহ্, আমরা যেন তাঁহার পবিত্র স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট মহাপথে যাত্রা করিতে পারি।

এই পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক প্রকৃতই জগতে অতুলনীয়। মানবের কর্ম্মপথ অসংখ্য, যাহার প্রবৃত্তি যে পথে চালিত করে, তিনি সেই পন্থানুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সব বিভিন্ন পথ যাত্রীকে তাহাদিগের লক্ষ্য-স্থানে চালিত করিতে পবিত্র কোরআনে যে সব নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার অনুরূপ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইবে না। ধ্বংসশীল সময়ের অপ্রতিহত গতিকে প্রতিহত করিয়া তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব খর্ব্ব করিয়া মানবকে কর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার জন্য "অল-আছর" অধ্যায়ের বিধি সকল প্রকৃতই অতুলনীয়। এছলামে শিক্ষার ভিত্তি অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা, মুছলমানগণকে প্রথম হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সে যেন তাহার অন্তরকে লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মপথে প্রথম পদক্ষেপ করে, তাহার পর কিছুদূর অগ্রসর হইলে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে এছলামের শিক্ষা তাহার কর্ম্মপথকে কত সরল ও সহজ করিয়াছে, তখন তাহার লক্ষ্য-স্থানে উপস্থিত হইতে আর তাহাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

জগতে যে কেহ কর্ম্মজীবনে যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই কোরআনের বিধি-নিষেধ প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ ভাবে পালন করিয়াছেন। প্রতিভাশালী মনীষিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, কর্ম্মজীবনে সাফল্য লাভ করিবার জন্য এমন সুন্দর সহজ পথ জগতের বক্ষে আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কোরআনের নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে প্রত্যেক মুছলমানকে উত্তেজিত করা হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা আলস্যের স্রোতে গা ভাসাইয়া নির্জ্জীব জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছেন, এবং মূকের মত চাহিয়া

দেখিতেছেন এই পবিত্র পুস্তকের পন্থানুসরণ করিয়া অনেক অমুছলমান কর্ম্ম জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে ;

"যশের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আমি নিশ্চয়ই আরোহণ করিব,"—মুছলমানের সে দৃঢ়তা কোথায় ? এই যে আকাঙ্ক্ষা—আমি নিশ্চয়ই শত বাধা অতিক্রম করিব, সহস্র কণ্টক দূর করিব, কর্ম্ম-স্রোতে জীবন-তরি এরূপ ভাবে চালিত করিব যে প্রতিকূল কোন স্রোত সে তরণীর তীব্রগতি কিছুতেই রোধ করিতে পারিবে না। একমাত্র বিশ্বাস এছলামের মূল ভিত্তি, আর এই ভিত্তির উপরই সমস্ত ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু সেই ভিত্তির প্রধান পদার্থ (মশলা mortar) যাহা তাহাকে বজ্রের মত কঠিন করিয়াছে, তাহা সাধনা। এই দুইটি বিশ্বাস ও সাধনা এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটিকে বাদ দিলে অপরটি এছলামের অভিধানে নিশ্চয়ই লুপ্ত হইবে। আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় এবং তাহা হইতে সমস্তই উদ্ভব, একই উপাদানে তিনি সমস্ত মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহার নিকট সকল মানবই সমান। যাহা একের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, অপরের দ্বারা কেন তাহা সম্ভব হইবে না ? এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মুছলমান তাহার জীবনে পূর্ণ-সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে এই একত্ববাদের উপর সন্দেহের ক্ষীণ রেখাটি পতিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে মুছলমানের পতন হইবে, মুছলমান মুছলমান নামের অযোগ্য হইবে।

সংসার মানব জীবনে পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র, সংসারে বাস করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আল্লাহ্‌র ভজনা করিতে এছলাম প্রত্যেক মুছলমানকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এছলামের নীতি অনুসারে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ মহাপাপ। এ সম্বন্ধে মহানবী বলিয়াছেন "লা রোহ্‌বা নিইয়াতান ফিল এছলাম" অর্থাৎ এছলামে সন্ন্যাসব্রত নাই। এক সময়ে হজরতের নিকটে বসিয়া তাঁহার কয়েকজন সহচর ধর্ম্ম সম্বন্ধে

কথোপকথন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন "আমি আজীবন দিবসে উপবাসব্রত অবলম্বন করিব।" অন্য একজন বলিলেন "আমি সমস্ত রজনী উপাসনায় অতিবাহিত করিব।" অপর আর একজন বলিলেন "আমি আজীবন অবিবাহিত থাকিব, কখন দার পরিগ্রহ করিব না।" তাহাদের এই সমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য তাহারা এই সমস্ত কার্য্য করিলে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন এবং আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয়পাত্র হইবেন। মহানবী তাঁহাদের এই সমস্ত অযৌক্তিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, আমি আমার মহাপ্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি আমি বোধ হয় তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে অধিকতর ভয় করি; কিন্তু আমি দিবাভাগে রোজাও রাখি, এফতারও (রোজা ভঙ্গ) করি, রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র উপাসনা করি এবং নিদ্রাও উপভোগ করিয়া থাকি, আর দার পরিগ্রহ করিয়া সংসার প্রতিপালনের দায়িত্বভারও গ্রহণ করিয়াছি। যিনি আমার এই নীতি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তিনি কখনও আমার দলভুক্ত হইতে পারিবেন না।

হিন্দুশাস্ত্রও সন্ন্যাসগ্রহণ সমর্থন করে নাই। পুরাণ পাঠ করিয়া আমরা যতটুকু অবগত হইয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ধর্ম্মাচরণের পবিত্র ক্ষেত্র সংসার। মুনি-ঋষিগণ অধিকাংশই সংসারী ছিলেন এবং দার পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। রাজর্ষি জনক আদর্শ সংসারী ছিলেন, রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠ দেব, ভৃগু মুনি, কবিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য, দেবগুরু বৃহস্পতি, মহামুনি ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ সংসারে থাকিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত নাই, একটানা স্রোতে যিনি জীবনটাকে ভাসাইয়া দিবেন, তাঁহার জীবনে সার্থকতা কোথায়? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে হিন্দু ও মুছলমান

উভয় ধর্ম্মের মূল নীতি এক, আমরা উভয়ে (হিন্দু ও মুছলমান) এই নীতি ভ্রষ্ট হইয়া আলস্যপরায়ণ, জড়ভাবাপন্ন ও নির্জ্জীব, আর সেই জন্য আজ আমরা জগতের চক্ষে হেয় এবং উপহাসাস্পদ।

যে ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া মহামতি হজরত মোহাম্মদ তাঁহার অনুচরবৃন্দকে জগতের মানবের চক্ষে পরম শ্রদ্ধাভাজন এবং বহু সম্মানাস্পদ করিয়াছিলেন, আজ মুসলমানের ভিতর সে ত্যাগ কোথায়? এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে "যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার অতি প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করিতে না পার, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি কিছুতেই মহত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

সৃষ্টির আদি হইতে মানবের কল্যাণ সাধনার্থ যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশবাণী লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত প্রত্যাদেশবাণী লোকহিতার্থ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল। পরিবর্ত্তনশীল কালের আবর্ত্তনে তৎসমস্তই বিকৃত ও অবিশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই জগতের প্রভু মহান্ আল্লাহ্ মহানবী হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) পুনরায় প্রত্যাদেশবাণী দান করিয়াছিলেন। ইহা সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব। মানবজীবনের পরিপূর্ণতা সাধনোপযোগী সমস্ত তত্ত্বই এই পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থে নিহিত এবং ইহার অনুরূপ একখানিও ধর্ম্মগ্রন্থ জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহা মনীষিগণের অভিমত আমরা এই গ্রন্থের শেষভাগে উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণের সহজেই বোধগম্য হইবে যে কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক সমস্ত তত্ত্ব এই পবিত্র পুস্তকে যেরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্ম-পুস্তকে নাই। বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন ঋষিকল্প পুরুষ প্রফুল্লচন্দ্র, পাশ্চাত্যগগনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর জর্জ্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw), দার্শনিক কবি গেটে,

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক, (Edmond Burke), লর্ড ডেভেনপোর্ট (Devenport), সার্ হরি সিং গৌর, অধ্যাপক মন্মথনাথ সরকার, ডাক্তার সপ্রু, পণ্ডিত জয়াকর, ব্যবস্থা-তত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন (Edward Gibbon), বস্ওয়ার্থ স্মিথ, (Bosworth Smith) দার্শনিক পণ্ডিত কার্লাইল (Carlyle), অধ্যাপক টি, ডবলিউ, আরনল্ড (T. W. Arnold), ডাক্তার জি, এ, লেফরয় (Dr. G. A. Lefroy), মিষ্টার হালাম (Hallam), Chambers' Encyclopedia, Popular Encyclopedia (চেম্বার্স এনছাইক্লোপেডিয়া ও পপুলার এনছাইক্লোপেডিয়া), সঞ্জীবনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার জনসন (Dr. Johnson) প্রভৃতি মনীষিগণের এছলাম, পবিত্র কোর্-আন এবং হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে অভিমত আমরা সাধারণের গোচরার্থ পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণের প্রতি এছলামের বাণী।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কিরূপ প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এছলাম তাহাদের ভিতর ভ্রাতৃত্বের পবিত্রভাব পরিস্ফুট করিয়াছে, তাহার তুলনা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। তাহাদিগের প্রতি সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এছলাম কি প্রকারে তাহাদিগকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। প্রথম হইতেই এছলাম মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা, পবিত্র আত্মা কিংবা জনসাধারণের নেতা কাহারও প্রতি কোনরূপ কুবাক্য বলিও না, তাহাদের কাহারও প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করিও না।

এছলামের শিক্ষার বিশেষত্ব এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পর হইতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সমস্ত ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট ধর্ম্ম উপদেষ্টা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সম্মানের পাত্র এবং কোন ধর্ম্মই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

(বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রচেষ্টা এছলামের নীতি-বিগর্হিত, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার, কি উৎপীড়ন, কি ভয়-প্রদর্শন, এছলামের ইতিহাসে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। এছলাম মুক্ত-কণ্ঠে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে কেহ যেন কখন সংগ্রামে লিপ্ত না হয়, কারণ সত্যের বিকাশ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় সত্যবাদীর, সত্যপথাশ্রয়ীর কখন বিনাশ নাই, অসত্যের বিলোপসাধন তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইবে। ২ : ২৫৬)

ভ্রমান্ধ মানবের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এই মহান্ ধর্ম্ম শাণিত কৃপাণের সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে এবং মানবমণ্ডলীকে অত্যাচারের সুদৃঢ় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া এই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এছলাম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা সত্যের অপলাপ আর কি হইতে পারে? এছলাম-শাস্ত্রে সরল ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে আর সেই নিরক্ষর মহামানব তাঁহার ভক্ত মুছলমানগণকে স্পষ্টাক্ষরে আদেশ দিয়াছেন, বিনা কারণে কখন যেন তাহাদের কৃপাণ কোষ-মুক্ত না হয়, বিপক্ষগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের অসি কোষ-মুক্ত করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য মুছলমানকে অসি চালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রযত্নে শান্তি অব্যাহত রাখিবার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন বিফল হইবে, তখনই তাহার হাতের অসি কোষ-মুক্ত হইবে, এছলাম শাস্ত্রে কিংবা মহা-নবীর উপদেশ বাণীতে ইহার অধিক তাহার অধিকার নাই। মুসলমান-গণের উপর এই যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ হিংসাপরায়ণ বিধর্ম্মিগণের প্রচারিত অসত্যের অবতারণা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, অধর্ম্মাচারিগণ এছলাম ধর্ম্মাবলম্বি-গণকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের হিংসার শাণিত কৃপাণ উত্তোলন করিয়াছিল, সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ্ই তাহা-দিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, মুছলমান কেবল উপলক্ষ মাত্র। সমস্ত জাতির সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে এছলাম যখন উন্নত মস্তকে সত্যের বাণী প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তখন সংযতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয় সাধুগণ সত্যের মোহে আকৃষ্ট হইয়া এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর সেই মুষ্টিমেয় সত্যাশ্রয়ী মুসলমানগণকে সেই বিশ্বপতি আল্লাহ্ই রক্ষা করিয়াছিলেন।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের সমস্ত কার্য্যে সুবিচারের পরিচয় দাও; আল্লাহ্‌র শপথ প্রত্যেক মানবের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিবে; ঘৃণাবশতঃ অবিচার করিবে না, ন্যায়বিচার কর, ইহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের নির্দ্দেশ। তাঁহার করুণাই তোমার বর্ম্ম, তুমি কি করিতেছ, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নয়।

যদি কোন লোক তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, অত্যাচার করে কিংবা তোমাকে আঘাত করে, তুমি তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইবে এবং তাহাকে ক্ষমা করিবে এই প্রকারে তুমি ঘৃণা এবং শত্রুতার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিবে, (তখন দেখিতে পাইবে) যে ব্যক্তি তোমার শত্রু ছিল, সেই ব্যক্তিই তোমার প্রিয়বন্ধু হইয়াছে। ৪১ : ৩৪

অত্যাচারের পথ হইতে নিবৃত্ত হও, কারণ আল্লাহ্ কখন অত্যাচারীকে ভালবাসেন না, যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন পৃথিবীর উপর আর অত্যাচার করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিও না। ৭ : ৫৬

এই সত্যবাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এছলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ কখন সত্যপথ ভ্রষ্ট হইতে পারে না। পবিত্র কোর-আনের এই উক্তিই সপ্রমাণ করিতেছে, মুছলমান কখন হিংসা ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মিগণের প্রতি অত্যাচার কি অবিচার করে নাই।

(কোন মানব কোন জাতির প্রতি ঘৃণা কি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিবে না, কারণ তাহাদিগের ভিতর তোমার অপেক্ষা সদগুণসম্পন্ন মানব থাকিতে পারে। ৪৯ : ১১)

পবিত্র কোর্-আনের এই শিক্ষা, মহাপ্রভু আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্ট মানবকে শিক্ষা দিতেছেন, এই শিক্ষার ভিতর কি উদার মহৎ ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃত যিনি মুছলমান, তাঁহার অন্তর শরতের

আকাশের মত নির্ম্মল, ফুলের মত পবিত্র আর সে অন্তরে কখন হিংসা-দ্বেষ স্থান পাইতে পারে না।

মহানবী তাঁহার ভক্তগণকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, "সর্ব্বৈকমে হিংসা ত্যাগ করিবে, অগ্নি যেমন তাহার ইন্ধনকে গ্রাস করে, হিংসাও শান্তির সমস্ত উপাদানকে গ্রাস করিয়া থাকে।

যে মানব তাহার সম্পত্তি রক্ষার্থে হত হন, তিনিই আল্লাহ্‌র দ্বারা গৃহীত হইবেন। অতএব তোমরা কেন যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ, যখন তোমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত।"

এই বাক্য মহানবী মোহাম্মদের মধু-নিস্যন্দী মুখ-কমল হইতে নির্গত হইয়াছিল। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে আত্মরক্ষার্থে, আত্মীয়-স্বজন, স্বধর্ম্মাবলম্বী ও স্বদেশ রক্ষার্থে মুছলমানগণের ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি মানবের অপকৃষ্টগুণের লেশমাত্র নাই, আছে শুধু কর্ত্তব্য, আর কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

হে বিশ্বাসী মুছলমানগণ, যখন তোমরা দেখিতে পাইবে সেই সব অবিশ্বাসী মানব অন্যায়পূর্ব্বক তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে, তখন তোমরা কদাচ তাহাদিগের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। মুছলমানগণ কেবলমাত্র যুদ্ধে লিপ্ত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে কিংবা তাহাদিগের সংহতি-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শত্রুগণের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অসন্তোষের পাত্র হইবে, তাহার বাসস্থান নরকে হইবে আর তাহার পরিণামও বিপদসঙ্কুল

হইবে। (মনে রাখিবে) তুমি তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, কিন্তু সেই আল্লাহ্ই, যিনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে আঘাত কর নাই কিন্তু সেই আল্লাহ্ই, যিনি তাহাদিগকে আঘাত করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিবেন, নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতেছেন, সমস্ত বিষয় জ্ঞাত আছেন। ৮ঃ ১৫, ১৬, ১৭, মুছলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক, তাহারা তৎপূর্ব্বে সেই মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত সত্য; এই স্বর্গ ও পৃথিবীতে তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, তাহারা তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্র অদৃশ্য হস্ত চালিত মুছলমানগণ ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। মাত্র তিনশত তরুণ-বয়স্ক অশিক্ষিত মুছলমান পর্য্যাপ্ত অস্ত্রহীন হইয়া কি প্রকারে কোন সাহসে সহস্রাধিক সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারে। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সেই মহান্ আল্লাহ্র অনুগৃহীত সেবক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যদি একমুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, শত্রু-বিনাশের পক্ষে তাহাই তাঁহার শাণিত কৃপাণ, কারণ সেই সৃষ্টি ও স্থিতির পালক ও সংহার কর্ত্তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। আল্লাহ্র অদৃশ্য হস্ত তাহাদিগকে সংহার করিয়াছে, তাঁহারই ন্যায় বিচারে তাহারা তাহাদের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যুদ্ধে হত, বিধ্বস্ত এবং পলায়মানপর হইয়াছিল, কারণ শৌর্য্যে-বীর্য্যে এবং শিক্ষায় সর্ব্বপ্রকারে তখন দশজন মুছলমানও একজন শত্রুর সমকক্ষ ছিল না।

ধর্ম্ম-যুদ্ধ কিংবা আত্মরক্ষা ভিন্ন মুছলমান কখনও কাহাকে আঘাত করিয়াছে এ' কথা ইতিহাসে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। শ্রীমদ্ভগবদ

গীতায় আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে এই প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্। ১১ঃ ৩৩, হে অর্জ্জুন, এই সমস্ত লোককে আমি পূর্ব্ব হইতেই মারিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও। ধর্ম্ম-যুদ্ধে লিপ্ত না হইলে তোমার অধর্ম্ম হইবে, মহাপাপ হইবে; অসতের অস্তিত্ব নাই, সত্যের নাশও নাই। জ্ঞানিগণ এই উভয়ের নির্ণয় জানিয়াছেন। ২ঃ ১৬, এই ঈশ্বরের বাণী মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদও তাহার ভক্তগণকে সেই প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, যখন তাহারা তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়া মোহাভিভূত হইয়াছিল। শত্রুগণের অমিত বিক্রম, প্রভূত বল, বিপুল যুদ্ধোপকরণ দেখিয়া মুষ্টিমেয় মুছলমানগণ যখন ভীত, সন্ত্রস্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সময় মহামানব মহানবী তাহাদিগকে সেইরূপ উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি কে, ইহারা পূর্ব্বে হত হইয়াছে, তুমিত নিমিত্তমাত্র।" পবিত্র কোর্-আনে উক্ত হইয়াছে "তুমি তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, কিন্তু সেই আল্লাহ্ যিনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। তুমি তাহাদিগকে আঘাত কর নাই, যদি তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিয়া থাক, সে আঘাত আল্লাহ্ই করিয়াছেন এবং সত্য বিশ্বাসিগণকে তিনি উত্তমরূপে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন, কারণ তিনি সকল বিষয় শ্রবণ করিতেছেন, সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন। ৮ঃ ১৭,) ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্ম-রক্ষার্থ মুছলমানগণ ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই অগ্রসর হইয়াছিল, নচেৎ সেই মুষ্টিমেয় মুছলমান-সৈন্য কখনও শত্রুর সেই বিপুল সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না কিংবা জয়লাভ করিয়া উল্লসিত-চিত্তে

গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিত না। বদরের যুদ্ধ তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। এছলাম ধর্ম্মের অনুশাসনে মুছলমান যুদ্ধক্ষেত্রে কোন প্রকার হিংসা কি অন্য কোন নিকৃষ্টভাব অন্তরে পোষণ করিবে না, শত্রুগণ যখন সন্ধির জন্য কি মিত্রতা স্থাপনের জন্য কোন প্রকার নিদর্শন উপস্থিত করিবে, মুছলমানগণ সেই মুহূর্ত্তে যুদ্ধে বিরত হইবে। প্রাণভয়ে পলায়িত শত্রুকে আক্রমণ করিয়া মুছলমান কখনও নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। শরণাগত শত্রুকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করাও মুছলমান তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে।

শৌর্য্যে ও বীর্য্যে মুছলমান কখনও অন্য জাতির অপেক্ষা হীন বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। অতুলনীয় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। এছলাম অনুশাসনে ভীরুতা মহাপাপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এছলামের পরম শত্রুও বলিতে পারিবে না মুছলমান কখনও কাহারও প্রতি অত্যাচার কি উৎপীড়ন করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়াছে। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, দুঃখী, পীড়িত, আর্ত্ত, বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত কি শরণাগতের প্রতি যিনি অত্যাচার, উৎপীড়ন করিবেন, এছলামের কঠোর অনুশাসনে তিনি মুছলমান নামে অভিহিত হইবেন না এবং তাঁহার স্বজাতীয়ের নিকট নিশ্চয়ই ঘৃণার পাত্র হইবেন।

শত্রু হউক, কি মিত্র হউক, স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী হউক, যে কোন ব্যক্তির জীবন বিপন্ন দেখিতে পাইলে যিনি প্রকৃত মুছলমান, তিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, মহান্ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইবে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া যদি কোন মুছলমান তাহাকে মৃত্যুর কবল

হইতে রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের পাত্র হইবে। দৈব কর্ত্তৃক, কি মনুষ্য কর্ত্তৃক, কি কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিপন্ন জীবন উদ্ধার করা প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কোন স্থানে কিংবা যে কোন সময়ে কোন মনুষ্যের কি কোন প্রাণীর জীবন বিপন্ন দেখিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুছলমান তাহার উদ্ধার সাধন করিবেন, যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে বিচারের দিনে তাঁহাকে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। কেবল মাত্র কৌতুক প্রদর্শনের নিমিত্ত কি আমোদ উপভোগের জন্য অস্ত্র উত্তোলন করাও এছলামের নীতি বিগর্হিত।

উদ্যমহীনতায়, বীর্য্যহীনতায় কি হতাশ্বাসে মছলমানের অন্তর কখনও ভাঙ্গিয়া পড়িবে না; সে হৃদয় লৌহের মত কঠিন, পর্ব্বতের মত উচ্চ এবং আকাশের মত প্রশস্ত ও উদার হইবে, অথচ কোমলতায় হইবে তাহা নবনীতুল্য। কোন জীবের সামান্যমাত্র পীড়া দেখিয়া তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস ছুটিবে। নিষ্ফলতার তীব্র কশাঘাত তাহাকে বীরের মত সহ্য করিতে হইবে, উদ্দীপনার অগ্নিময় স্রোত তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইবে। বিপদের ঝড় অতি প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে, মছলমান স্থিরপদে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এতটুকু কম্পিত হইবে না। ধৈর্য্য তাহার সম্পদ, অধ্যবসায় তাহার ঐশ্বর্য্য, মনের একাগ্রতা তাহার ধনরত্ন। সহস্র প্রলোভনেও তাহাকে কর্ত্তব্য-হীন করিতে পারিবে না। সহস্র বাধা, সহস্র শয়তানের সম্মিলিত শক্তি তাহাকে ন্যায়পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে।

এছলামের অনুশাসন কোন রাজপথে, কোন ভ্রমণপথে উপবনে

কি কোন প্রকাশ্য স্থানে কোন মুছলমান কোন প্রকার কলহ বিবাদে লিপ্ত হইতে পারিবে না, কারণ তাহা করিলে সাধারণের শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে. মানবকে কর্ত্তব্যের পথে চালিত করা, অধর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করা মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ত্তব্যহীন কি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট লোক যেন কোন প্রকারে প্রাণে আঘাত প্রাপ্ত না হয়; সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাই এছলামের অনুশাসন। মঙ্গলময়ী তাহার প্রকৃতি, মানবের মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া মুছলমান সর্ব্বদা আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

এছলামধর্ম্মাবলম্বিগণ তাহাদের জীবনের শুভ অশুভ, আনন্দ-বিষাদ, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি, খ্যাতি অখ্যাতি সমস্তই সেই মহান আল্লাহ্‌তে সমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনে কর্ত্তব্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তাহার মন আল্লাহ্‌তে যুক্ত, চিত্ত আল্লাহ্‌তে অনুরক্ত, হৃদয় আল্লাহ্‌তে সমাহিত; আল্লাহ্‌র ধ্যানে, আল্লাহ্‌র জ্ঞানে, আল্লাহ্‌র কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এছলামের এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে, এই অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া জগতের লোক স্বেচ্ছায় এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এছলামের গণ্ডীর মধ্যে আগমন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছে। প্রকৃত এছলাম ধর্ম্মাবলম্বীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। নরোত্তম মহানবীও স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন, তিনি তাহার সর্ব্বস্ব আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করিয়া সদানন্দে বিভোর ছিলেন। তাঁহার ভক্তগণকেও তিনি এইভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। এছলামের বিশেষত্ব এই, যত বড় দুঃখ উপস্থিত হউক না কেন, মুছলমান কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইবে না এবং দুঃখ আল্লাহ্‌র দেওয়া বলিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে।

এই যে ভিত্তিহীন জনশ্রুতি যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এক হস্তে কোর্-আন আর অপর হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া এছলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা কাল্পনিক মিথ্যা এবং এছলাম বিদ্বেষী ধর্ম্মদ্রোহী কাফেরগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতে সাম্যবাদ প্রচার করাই এছলামের মূলনীতি এবং পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচারকগণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করাও এছলাম ধর্ম্মের বিশেষত্ব। এছলামের সৌন্দর্য্য ও মহত্বই এছলাম বিস্তৃতির মূল কারণ, এখানে সহিষ্ণুতা কি অসহিষ্ণুতার কোন প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না। ভীতি প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের রীতি পবিত্র কোর-আনে কোথাও দৃষ্ট হইবে না।

(পবিত্র কোর্-আনে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে :—

আমরা তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছি; এজন্য সে ধন্যবাদ দিতে পারে কিংবা নাও দিতে পারে। ৭৬ : ৩

সত্যের বাণী তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছে, এজন্য সে বিশ্বাস করিতে পারে কিংবা অবিশ্বাসী থাকিতে পারে। ১৮ : ২৯

প্রকৃতই তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যবাণী সমাগত হইয়াছে, এবিষয়ে যে কেহ জ্ঞান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, তাহা তাহারই আত্মার মঙ্গলের জন্য এবং যে কেহ অবিশ্বাস করিবে, সেই অবিশ্বাস তাহার আত্মার বিরুদ্ধেই কার্য্যকরী হইবে। ৬ : ১০৫

যদি তুমি সৎকার্য্য কর; তাহা তোমার আত্মার মঙ্গল বিধান করিবে, এবং যদি তুমি অসৎকার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি অসৎফল প্রাপ্ত হইবে। ১৭ : ৭)

মুছলমানগণকে যুদ্ধ করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? ধর্ম্মজগতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্ত অত্যাচার অনাচার নিবারণ করিতে মুছলমানগণকে কখন কখন ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ধর্ম্মের অনুশাসনে পরধর্ম্মিগণের উপাসনা স্থান এবং তাহাদিগের ধনপ্রাণরক্ষা করাও মুছলমানগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—

এবং যদি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হস্ত চালিত হইয়া তাহারা (ধর্ম্মদ্রোহী কাফেরগণ) তাহাদের দ্বারা (মুছলমানের দ্বারা) বিতাড়িত না হইত, তাহা হইলে ধর্ম্ম-মন্দির, গির্জ্জা, মঠ, মসজেদ প্রভৃতি উপাসনা স্থান, যে স্থানে সতত মহান্ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্ত্তন, কিম্বা তাহার পবিত্র নাম স্মরণ করা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত উপাসনা স্থান ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইত। ২২ : ৪০

(অত্যাচারী যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অত্যাচারের স্রোত প্রতিহত না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে, কারণ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভক্ত লোক সকলের জন্য। ২ : ১৯৩

যখন আর কোন উৎপীড়ন দেখিতে পাইবে না, তখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে। কারণ আল্লাহ্ নিত্য ক্ষমাশীল। ২ : ১৯৩)

এইরূপ উক্তি পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে দৃষ্ট হইবে। অত্যাচার-পীড়িত, ভীত ও নির্য্যাতিত জাতিকে প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য পবিত্র কোরআন মুছলমানদিগকে নিত্য প্রবুদ্ধ ও অবিরত উৎসাহিত করিয়াছে। যখন অত্যাচারের স্রোত অতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, ধর্ম্মপরায়ণ মুছলমানগণ নিজেদের প্রাণ উপেক্ষা করিয়া দলে দলে সেই স্রোতের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যখন

তাহাদের অতুলনীয় শৌর্য্যে ও বীর্য্যে সে স্রোত প্রতিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তাহারা তাহাদের অসি কোষবদ্ধ করিয়াছে।

(কিন্তু শত্রু যদি নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। কারণ তিনি যে পরম দয়ালু। পবিত্র কোর-আনের বাণী এই যে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধে রত থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অত্যাচারী নিবৃত্ত না হইবে। ২ : ১৯২)

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষগণ যে মুহূর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব করিবে, মুছলমানগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবে। শত্রুগণের সমস্ত কপটতা সরলতার আবরণে আবৃত করিয়া মুছলমান তাহার পরম শত্রুকেও বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিবে। শত্রু যে একদিন প্রচ্ছন্নভাবে তাহার হিংসার ছুরিকা তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিতে পারে, এ কথা মছলমান কোনদিন ভাবে নাই, তাহার সরল চিত্তে স্থান দিতে পারে নাই। সরল প্রাণে সকলকে বিশ্বাস করিতে মুছলমান চিরদিন অভ্যস্ত, ছলনা কি কপটতা মুছলমানের অন্তরে কোন দিন স্থান পায় নাই। নীচ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কাহারও প্রাণে আঘাত দেওয়া মুছলমানের নীতি-বিগর্হিত। অতি বড় শত্রুও কখনও অপবাদ দিতে পারিবে না যে মুছলমান প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কি সত্যের অপলাপ করিয়া সে কখন যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। এছলাম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, মুছলমান ন্যায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত, ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তবুও হীন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কখন অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া সে তাহার আত্মাকে কলুষিত করে নাই।

অনাত্মীয় এবং পর এই দুইটি শব্দ এছলামের অভিধানে কোথাও দৃষ্ট হইবে না। ভাব চক্ষে মুছলমানের অন্তর নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে সেই ক্ষুদ্র বক্ষের ভিতর যেন উদার অনন্ত আকাশ, সমস্ত জগতের

চিত্র সেই আকাশের গায়ে প্রতিবিম্বিত। প্রাবৃটের বর্ষণ, হেমন্তের শিশির, নিদাঘের সহস্র সূর্য্যের প্রখর কিরণ, কত ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত প্রভৃতি নৈসর্গিক কত উৎপীড়ন সেই আকাশের গায়ে ধারণ করিতেছে, আবার সেই আকাশে শত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ হাসিতে পৃথিবীর মানবের চিত্ত হরণ করিতেছে। মহান্ আল্লাহ্‌র প্রিয়তম সেবক মছলমানকে যেন সহস্র চক্ষু দিয়াছেন, জগতের দুঃখ দেখিয়া তাহার সহস্র চক্ষু দিয়া ধারা বহিয়া গেলেও সে তাহার প্রাণের সন্তাপ দূর করিতে পারে না, সহস্র হস্ত দিয়া মানবের অভাব মোচন করিলেও সে সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না। প্রবৃত্তি মার্গের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াও ধর্ম্মের অনুশাসনে সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আল্লাহ্‌র বাণী,—বিস্মৃতির আবরণে এক মহূর্ত্তের জন্যও যদি তাহার বিবেক আবৃত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার পতন হইবে। এই মুছলমান হিংসার পথ অবলম্বন করিয়া জগতের বক্ষে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, একথা যিনি মনের কোণেও চিন্তা করিবেন, তাঁহাকে ভ্রান্ত ছাড়া আর কি বলিতে পারি।

এছলাম শাসন-প্রণালী

রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ—

বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্ আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা তাঁহারই উপর শাসন করিবার দায়িত্বভার অর্পণ করিবে, যিনি সর্ব্বপ্রকারে সেই ভার বহন করিবার উপযুক্ত হইবেন এবং যাহারা শাসক পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা যেন ন্যায়ের উপর তাঁহাদের সিংহাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে মনোনীত না করিলে আল্লাহ্র তিরস্কারভাজন হইবে। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয় শুনিতেছেন, সকল বিষয় দেখিতেছেন। ৪ ; ৫৮

প্রথমেই সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিবার দায়িত্বভার তাহাদিগের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন বিদেশীয় কি সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কোন লোকের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিবার অধিকার ছিল না; কিংবা শাসন-কর্ত্তার পদ কি রাজপদ কোন ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী সূত্রে কি জন্মগত অধিকারে প্রাপ্ত হইতেন না। এছলাম জগতে সম্রাটকে খলিফা নামে অভিহিত করা হইত, ইনি প্রজা সাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া তাহাদিগের ধন প্রাণ ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। প্রজা সাধারণ তাঁহার উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করিত, তিনি কেবলমাত্র সেই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিতেন, তদতিরিক্ত কোন ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর শাসনপ্রণালীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল;

অযোগ্য পাত্রে এই দায়িত্বভার অর্পণ করিলে তাহারা আল্লাহ্র অসন্তোষের পাত্র হইত। খলিফার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুমাত্র ছিল না; তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি সাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং তাহাদিগের ন্যায়ও ধর্ম্মানুগত অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োগ করিতেন। সাধারণের উপকারার্থ নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা বিদ্যালয়, বিচারালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্ম-মন্দির গির্জ্জা মছজেদ ইত্যাদি রক্ষা করাও খলিফাব অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে এবং দেশের সমস্ত প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিতে তিনি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন।

এছলামের নীতি অনুসারে সাম্রাজ্যের ভিতর যে ব্যক্তি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, শৌর্য্যে ও পরাক্রমে, শীলতায় ও সহিষ্ণুতায়, সবলতায় ও মৃদুতায়, অপৈশুনতায় ও আর্জ্জবে, ত্যাগে ও ক্ষমাগুণে সমস্ত মানব মণ্ডলীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শাসন করিবার গুরুতর দায়িত্বভার বহন করিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, মুছলমানগণ তাঁহাকেই বহু সম্মানাস্পদ খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য ছিলেন। অন্যান্য প্রজাপরতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে যেমন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এছলাম বাজ্যে সে বিধি প্রচলিত ছিল না। খলিফা তাহার জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। এই শাসক অর্থাৎ খলিফাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইত যে সেই মহান্ আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণীকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পালন ও রক্ষণ কবিবার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। জাতীয় ধনভাণ্ডারের তিনি একজন রক্ষক ছিলেন মাত্র। তাঁহার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিম্বা ভোগবিলাসের জন্য তাহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহাব ছিল না. সাধারণ লোকের মত তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত

বৃত্তি তাহার উপদেষ্টাগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইত। অধিকাংশ প্রতিনিধি-বর্গের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইত ; কিন্তু তাহার স্বার্থহীনতায় এবং নিরপেক্ষতায় তিনি সাধারণ প্রজাবর্গের এইরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে অধিকাংশ কার্য্যে প্রজাবৃন্দ তাঁহার মতই অনুমোদন করিত। তাঁহার সত্যানুরক্তি ও ন্যায়পরায়ণতায় বিমুগ্ধ সাম্রাজ্যের আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে খলিফার মস্তকোপরি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র আশীর্ব্বাদ নিয়ত বর্ষিত এবং তাঁহারই অদৃশ্য হস্তে তিনি সর্ব্বদাই চালিত। তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ফলাকাঙ্ক্ষা ছিল ধর্ম্মের অনুমোদন এবং সমস্ত জীবনের সহচর ছিল ধর্ম্ম ; সুতরাং ধর্ম্মের অনুগামিনী গুণরাশি যথা—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, অনসূয়া ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি সর্ব্বদা অলঙ্কৃত ছিলেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বহুবিধ শাসনপ্রণালী গঠিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; কিন্তু যে ব্যক্তি এছলাম শাসনপ্রণালী পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী আজ-পর্য্যন্ত অপর কোন লোক গঠিত করিতে পারে নাই। ইহা একদিকে যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ-গণতন্ত্র, অন্যদিকে সেইরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য। এছলামের সিংহাসন কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় কি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা গঠিত কি স্থাপিত হয় নাই। ইহা সেই সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভুর দ্বারা স্থাপিত শান্তিরাজ্য অথবা ধরণীতে স্বর্গরাজ্য, কারণ খলিফার একমাত্র গর্ব্ব করিবার হেতু—তিনি সমস্ত জীবনে সেই মহাপ্রভুর একজন দীনতম সেবক, প্রজাবর্গের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার জন্ম এবং সমস্ত জীবন উৎসর্গীকৃত।

খলিফার কর্ত্তব্য—অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গকে সর্ব্বপ্রকার

বিপদ হইতে মুক্ত করা এবং তাহাদিগকে অভাব ও দৈন্যের তাড়না হইতে রক্ষা করা ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সকল প্রকার উপদ্রব, উৎপীড়ন, অত্যাচার দুরীভূত করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে নিত্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার সমস্ত জীবনেব লক্ষ্যীভূত বিষয় ছিল। এক বিষয়ে তিনি অপ্রাতিদ্বন্দ্বী এবং তাঁহার ক্ষমতাও অপরিসীম ছিল; দেশের ও দশেব কল্যাণ কামনায় সহস্র বাধা উপেক্ষা করিয়া যে কোন শুভ প্রতিষ্ঠান নিৰ্ম্মাণকল্পে তিনি আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিতেন।

এছলাম বিধি ও শাস্ত্রানুসাবে খলিফার উপর যে ক্ষমতা বিন্যস্ত করা হইয়াছিল, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ এইস্থানে তাহাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এ সম্বন্ধে পবিত্র আত্মা হজরত মোহাম্মদ (করুণাময় আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হউক) বলিয়াছেন—

("প্রত্যেক শাসনকর্ত্তা একজন মেষপালকের সমান, তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির ধন ও প্রাণ রক্ষার জন্য দায়ী; যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার পরিজনবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী, প্রত্যেক স্ত্রীলোক যেমন তাঁহার স্বামী-পুত্রের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য দায়ী, প্রত্যেক ভৃত্য যেমন তাহার প্রভুর ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য দায়ী, সেই প্রকার খলিফাও তাঁহার প্রত্যেক প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দায়ী।")

ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে মুছলমান সম্রাট্‌কে একজন মেষপালকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মেষপালক যেমন তাহার অধীনস্থ প্রত্যেক মেষকে হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য, তাহাদের আহার্য্য ও বাসস্থান দান করিতে বাধ্য, সেই প্রকার মোছলেম সম্রাট তাঁহার

অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীকে বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। সাম্রাজ্যের ভিতর দুঃস্থ, অসহায় এবং অকর্ম্মণ্য প্রজাবর্গের অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করাও তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। বুভুক্ষিত প্রজার ক্লিষ্ট বদনের প্রতি স্নেহের দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মুখে পিতার ন্যায় অন্ন তুলিয়া দেওয়া মোছলেম সম্রাট্ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র আদেশ বলিয়া মনে করিতেন, প্রজাবর্গের নৈতিক চরিত্র গঠিত করা, প্রাথমিক শিক্ষা দান করা এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে চালিত করা তাঁহার জীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

এছলাম ধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের উদারনীতি ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সম্বন্ধে বহু মনীষী বহুতর সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ উদাহরণস্বরূপ হজরত ওমরের জীবনী হইতে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি উদ্ধৃত করিলাম। মুছলমান সম্রাট্‌গণের আচরিত রীতি অনুসারে একদিন হজরত ওমর সহর পরিদর্শনার্থ ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যানুরক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রজার কোন অভিযোগ আছে কিনা জ্ঞাত হইবার জন্য এবং প্রজাগণ কি প্রকারে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বিপুলকীর্ত্তি হজরত ওমর কখন কখন এই প্রকার ছদ্মবেশে বাহির হইতেন। সহর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী সরার নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে, তিনি কোন লোকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার পর হৃদয়বান্ খলিফা যেদিক হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক অগ্নিতে কোন পাত্র রাখিয়া তাহা অবিরত সঞ্চালিত করিতেছে। কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর রোরুদ্যমান সন্তানদিগকে দেখাইয়া বলিল, দুইদিন যাবৎ সে তাহাদের বুভুক্ষিত মুখের মধ্যে কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া দিতে পারে নাই। শূন্যপাত্র অগ্নিতে রাখিয়া সে তাহার সন্তানদিগকে বৃথা আশ্বাস দিতেছে; খাদ্যদ্রব্য সত্বর প্রস্তুত হইবে মনে করিয়া যদি তাহারা নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। মহাপ্রাণ ওমর স্তম্ভিতভাবে বৃদ্ধার অনশন-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিলেন এবং তাহার সকরুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। ক্ষুধিত শিশুদিগের অন্তরের যাতনা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া নিজের কর্ত্তব্যহীনতার জন্য নিজের উপর সহস্র ধিক্কার দিলেন এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ-হৃদয়ে মদিনাতে প্রত্যাগমন করিলেন। আত্মগ্লানি যেন তাঁহাকে সর্পের মত দংশন করিতে লাগিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি একটি থলিয়ার মধ্যে আটা, ময়দা, ঘৃত, খর্জ্জুর ইত্যাদি পূর্ণ করিয়া একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন সে যেন তাঁহার মস্তকে সেই ভার তুলিয়া দেয়। ভৃত্য বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর নিজে যখন সেই বোঝা বহিতে চাহিল, মহাপ্রাণ ওমর তখন তাহাকে বলিলেন "নিশ্চয় তুমি এই ভার বহন করিতে সমর্থ ; কিন্তু সেই বিচারের দিনে আমার ভার কে বহন করিবে ?" তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া" তিনি যে মহাপাপ করিয়াছেন, সেই বোঝা নিজের মাথায় বহন করিলে, যদি সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ইনি এছলাম জগতের ধর্ম্মগুরু, এছলাম সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি। রাজা তাঁহার দীন প্রজার ভারবাহী "মুটে" প্রজাসাধারণের ভৃত্য, প্রজার সুখ-দুঃখে, সম্পদ-বিপদে, আনন্দ-বিষাদে, তিনি তাহা-দিগের সহিত সমান অংশ ভোগ করিতেন ; তিনি যেন একে সহস্র,

সহস্রে এক। বিলাস তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে, ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে, প্রভুত্ব তাঁহাকে দৃপ্ত করিতে এবং ক্ষমতা তাঁহাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার আকাঙ্ক্ষার সাগর উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস ছুটিত, সে উচ্ছ্বাসে শত্রু, মিত্র, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী প্রত্যেক প্রজা আকৃষ্ট হইত, কামনার সহস্র তরঙ্গ যেন সহস্রদিকে ছুটিয়া যাইত, প্রত্যেক তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিত, তিনি সাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একজন দীনতম সেবক, তাঁহারই অনুজ্ঞায় প্রজাবর্গ তাঁহার আত্মজ অপেক্ষাও প্রিয়তম। "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ"—মহাকবির এই বাক্য মহামতি ওমর তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হজরত ওমরের আত্মীয় নাই, পর নাই, শত্রু নাই, মিত্র নাই। একই উপাদানে এই মানবদেহ গঠিত, মানব-প্রকৃতি সেই বিশ্বস্রষ্টার নিপুণ হস্তে একই ভাবে নির্ম্মিত, শোকে দুঃখে সমানভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই মহৎভাব তাঁহার অন্তরে চিরদিনের জন্য প্রস্ফুটিত ছিল। ত্যাগের মন্দিরে বৃথা ভোগ-বিলাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি উৎসর্গ করিয়া কেবলমাত্র কর্ম্মস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া মহাপ্রাণ ওমর অন্তরে বিমল শান্তি উপভোগ করিতেন। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ এই সত্যনিষ্ঠ মহাত্মার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহাদের বিলাস রঙ্গমঞ্চে এই মহামতির যে বিকৃত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত হইতে হয়। যিনি নিরক্ষর হইয়াও শিক্ষার জন্য সহস্র পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, এই ওমর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য। খলিফার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহামতি ওমর মুছলমান-গণকে শিক্ষিত করিবার জন্য সমস্ত সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, শিক্ষিত

সুধীবৃন্দকে সম্মানের সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। আলেকজান্দ্রিয়ার বৃহত্তম পাঠাগার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার এই যে মিথ্যা কলঙ্ক যিনি এই মহামতির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গিয়াছেন আর যে ঐতিহাসিক এই জ্বলন্ত মিথ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বিচারের দিনে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিবেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা সে সমস্ত কথার সম্যক্ আলোচনা না করিয়া মহামতি ওমরের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের পাঠকবর্গকে মান্যবর বিচারপতি আমীর আলির কৃত স্পিরিট অব ইসলাম (Spirit of Islam) পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মহামতি হজরত ওমর কলঙ্কলেশহীন ছিলেন।

খলিফাদিগের রাজত্বকালে সাধারণের সুবিধার্থ প্রত্যেক নগরে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুণগ্রাহী খলিফা গুণের তারতম্য বিচার করিয়া উপযুক্ত লোককে বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহারা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পবিত্র কোরআনের বিধি অবলম্বন করিয়া ন্যায়-বিচার করিতেন। উৎকোচ গ্রহণ কি উৎকোচ প্রদান উভয় কার্য্যই আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল, প্রমাণিত হইলে উভয় কার্য্যের জন্য উভয়কে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। আইনের শৃঙ্খলা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রত্যেক প্রজাই বাধ্য ছিল। বিচারপতির নিরপেক্ষতার বিষয় উল্লেখ করিয়া একদিন হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন, যদি আমার কন্যা ফাতেমা চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হয়, তাহাকেও আইন অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (মহান্ আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমাদের হৃদয়পটে যেন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত থাকে)।

(খলিফাগণের শাসনকালে বিচারালয়ের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত

হইত। বিচারপতিগণের আসন সকলের উর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছিল। বিচারপতির ন্যায়দৃষ্টিতে খলিফা এবং তাঁহার অতি দরিদ্র প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যে কোন প্রজা খলিফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পারিত। উব্বায় ইবন-ই-কাযা-আজ নামক জনৈক প্রজা হজরত ওমরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তিনিও আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিচারপতি তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার্থ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলে হজরত ওমর বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আইনের চক্ষে রাজার ও প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন, বিচারপতি তাঁহাকে এইরূপ অন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করাতে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন।" হজরত ওমর অভিযোগকারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই মরুভূমির সীমান্ত প্রদেশে একজন নিরক্ষর উষ্ট্রপালক কেবল-মাত্র করুণাময় আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যেন অনন্ত-শূন্যে দাঁড়াইয়া বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ত্যাগের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এছলাম একদিন পৃথিবীতে এক অখণ্ড অভেদ্য বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। এছলামের ত্যাগে, মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিশ্বের প্রায় সমস্ত মানব একদিন এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। সেই অনুর্ব্বর মরুবক্ষে একটি ক্ষুদ্র প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, প্রেম ও ভক্তির বারি সেই ক্ষুদ্র প্রসূন-বৃক্ষের মূলদেশে নিত্য সিঞ্চিত হইতে লাগিল, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সুদৃঢ় প্রাকারে তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচণ্ড হিংসার আগুন হইতে রক্ষা করা হইল। কালস্রোতে ভাসিয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীর লোক,

সেই ক্ষুদ্র প্রসূন-বৃক্ষতলে সমবেত হইতে লাগিল, সেই ক্ষুদ্র প্রসূনের সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা মানবত্বের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিল। তখন স্বর্গ হইতে স্বর্গাধিপতির মঙ্গল, আশীর্ব্বাদ সহস্রধারে তাহাদের মস্তকে বর্ষিত হইল। এই ক্ষুদ্র প্রসূন এছলাম, হজরত মোহাম্মদের ভক্তি, অধ্যবসায় ও একাগ্রতায় প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে ইহার সুগন্ধ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। পাশবিক বলে কি আসুরিক ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মুসলমান কাহাকেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে নাই।

সমস্ত জীবনে খলিফা কখনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই কিংবা হিংসা ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কখন ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, যে কোন ব্যক্তি সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবেন, তিনিই আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এবং যে কোন ব্যক্তি অসৎকার্য্য করিবেন এবং অসৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবেন, তিনি সেই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হইবেন। পবিত্র কোরআনের এই উক্তি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া খলিফাগণ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। কাম, ক্রোধ বিজয়ী সদা সংযতচিত্ত খলিফা পরহিতার্থ সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতেন; কিন্তু যশঃ-লিপ্সা কখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কর্ত্তব্যই শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্যই মহান্ এবং কর্ত্তব্যই মানবজীবনে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপান। কর্ত্তব্যের আহ্বানে স্রোতের মুখে তৃণের মত তিনি আপনাকে ভাসাইয়া দিতেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে যেন অঙ্কিত করা হইয়াছিল তিনি সেই মহান আল্লাহ্‌র সেবক, তাঁহার পরিচারক এবং তাঁহারই আজ্ঞাপালক। তাঁহার স্বাধীন সত্তা সমস্তই আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই মনে রাখিতেন তিনি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভুর প্রতিভূ,

তাঁহারই দ্বারা চালিত হইয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন জ্ঞানের দ্বার মুক্ত করিয়া সমস্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এই একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন যে, বিচারের দিনে তিনি যেন সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণকে তাঁহার সমস্ত কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন।

আমাদের দেশে শিশু-সন্তানের জ্ঞানোদ্রেক হইবার পর হইতে জনশ্রুতি সহস্রদিক হইতে তাহার কোমল অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে মুছলমান বাদশাহ, মুছলমান নবাব প্রভৃতি সাধারণতঃ মনুষ্যত্বহীন এবং অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের শাসনপ্রণালীর কোন বিধি-ব্যবস্থা ছিল না, তাঁহাদের রাজত্বকালে কোন প্রজা সন্তুষ্ট ছিল না কিংবা তাহারা সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতে পারিত না। পিতামহী, মাতামহীর নিকট শ্রুত উপকথার মত বাদশাহদিগের অত্যাচারের কথা বালকগণের অন্তরে চিরদিন মুদ্রিত থাকে। কিন্তু মুছলমান বাদশাহদিগের রাজত্বকালে এই বিশাল ভারতভূমে প্রজা-সাধারণ কি প্রকার সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিত, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক রেভারেণ্ড জি, আর, গ্লেগ (Revd. G. R. Gleg) প্রণীত লর্ড ক্লাইভের জীবন চরিত (১৯ পৃষ্ঠা ৩য় পরিচ্ছেদ) হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।—

"১৬১২ খৃষ্টাব্দে যখন কতিপয় ইংরাজ বণিক্ ব্যবসায় উপলক্ষে সুরাট বন্দরে অবস্থিতি করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তদ্দেশবাসী লোক সকলের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং তাহাদের অর্থসম্পদ্ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। এমন কি সে সমস্ত বিষয় বর্ণনাতীত বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তখন

তাঁহাদের প্রসার প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও প্রভাব কিছুমাত্র ছিল না, সামান্য একজন নাগরিকের অধিকার লাভের জন্য তাঁহারা লালায়িত হইতেন; এই ভারত-ভূমি তখন অর্থসম্পদে এবং ঐশ্বর্য্য গৌরবে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের বিপুল ধনরত্নের ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদের তুলনা হইত না। আর এই ভারতবর্ষই তখন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া লোকচক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিল। জ্ঞানবত্তায়, বুদ্ধিমত্তায়, শৌর্য্যে, বীরত্বে সর্ব্বরকমে ভারতবাসী জগতের অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় কোন অংশে হীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। সাধারণ প্রজাবৃন্দ যদিও ভারত-সম্রাট্‌কে চক্ষে দেখিতে পাইত না, তথাপি জনশ্রুতি সম্রাটের বিলাস-বৈভব, শোভা ও সমৃদ্ধি সর্ব্বত্র প্রচার করিত। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত একছত্র অধিপতি ভারত সম্রাট্ এই অতি বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য কিরূপ শৃঙ্খলার সহিত শাসন করিতেন, তাহার পরিচয় পাইয়া বৃটিশ বণিকৃগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র রাজকর্ম্মচারী পর্য্যায়ক্রমে একের উপর অন্যে আধিপত্য করিয়া, একের অসঙ্গত কার্য্য অন্যে সুসঙ্গত করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত পালন করিয়া সেই বহুধা বিভক্ত প্রদেশসমূহে কিরূপ শৃঙ্খলার সহিত শাসনপ্রণালী নির্ব্বাহ করিতেন। রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ, সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্য-প্রণালী কিরূপ সতর্কতা ও নিপুণতার সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ব্বাহ হইত, অপরিচিত বৈদেশিকগণ এই সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং জনসাধারণের সভ্যতার বিষয় অবগত হইয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। দেশের শান্তি ও আইনের শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে নগররক্ষকের (পুলিশ কর্ম্মচারী) এবং দাওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের ন্যায় বিচারের

জন্য সদরালা ও কাজি সাহেবদিগের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সৈন্যগণ সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে সেরূপ আভিজাত্যের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের মহিমা, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। সাধারণ শ্রমিকগণ কৌপীনধারী দিগম্বরের মত বিচরণ করিলেও তাহাদের মনে শান্তি ও অন্তরে সুখ ছিল। তাহাদের শয্যা মাত্র একটি মন্দুরা, ঐশ্বর্য্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত জলপাত্র, তৈজসপত্রাদি এবং বাসস্থান সামান্য পর্ণকুটীর ছিল। তাহাদের স্বভাব অতি নম্র এবং সর্ব্বদা বিনীত। কৃষি শিল্পে, যন্ত্র শিল্পে, কি বয়ন শিল্পে তাহাদের কার্য্যকলাপ ও অভিজ্ঞতা যাহারা আজন্ম কেণ্ট, কি ম্যাঞ্চেষ্টার, কি লণ্ডনে প্রতিপালিত, তাহারাও বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিত। নানাবর্ণে রঞ্জিত, বহু চিত্রাবলি-শোভিত সুরম্য গগনস্পর্শী বিস্তৃত রাজপ্রাসাদে ভারতের রাজন্যবর্গ ও জমিদারগণ বাস করিতেন। ভারতের হাটবাজার, দেবমন্দির, মৃতের সমাধিস্থান বৃটনের তৎকালীন বণিক্‌গণ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিতেন। বহু জনপূর্ণ সহর, সহরের শোভা ও সমৃদ্ধি নাগরিকগণের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ, রাজকীয় শাসনপ্রণালী, নগররক্ষক রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা, উৎসব ও আনন্দ-কোলাহলমুখর শোভাযাত্রা বিদেশী বণিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিত। ইংরাজ কুঠীর কর্ম্মচারিগণ যে সব পত্র বিলাতে তাঁহাদের মনিবকে লিখিয়া পাঠাইতেন, প্রত্যেক পত্রেই এদেশের রাজন্যবর্গের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্ বিশদরূপে বর্ণনা করিতেন এবং তাঁহাদের মালেকগণও তাহাদের প্রেরিত প্রত্যেক পত্রে উপদেশ দিতেন যেন তাঁহারা সেই সব রাজন্যবর্গের উপদেশ ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করেন।")

বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকগণ মুছলমান বাদশাহ, নবাব এবং মুছলমান রাজকর্ম্মচারিগণকে যেরূপ বিকৃত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন, হিন্দু ও

অন্যান্য জাতি সেই বীভৎস চিত্র দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে মনুষ্য নামের অযোগ্য বলিয়া তাঁহাদের উপর সহস্র ধিক্কার দিয়াছেন। স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের সিংহাসনের ভিত্তি, প্রজা-পীড়ন তাঁহাদের অন্তরের তৃপ্তি ছিল এবং হিংস্র প্রকৃতিতে তাঁহারা বন্য পশুরও অধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেক-বর্জ্জিত ছিলেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ ছিল, সকল প্রকার অত্যাচার-অনাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া তাঁহারা অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করিতেন। কিন্তু এই একটি কথা যাহা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এই একটি কথা "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" অর্থাৎ দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বরের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া হিন্দুগণ তাঁহাদিগের নামে বিপুল জয়ধ্বনি করিয়াছেন, এই একটি কথা দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তরের তৃপ্তি, হৃদয়ের ভাব, মনের আনন্দ সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে, এই একটি কথা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক-জীবনে কত শান্তি, পারিবারিক-জীবনে কত সুখ পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এই একটি কথা দ্বারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ তাঁহার হিন্দু প্রজাগণের চক্ষে কতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধার-পাত্র ছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই একটি কথাতে কত ভাব, কত সম্পদ্ নিহিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রে দেশাধি-পতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, রাজা ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া তাঁহার আদেশ পালন করা হিন্দুগণ পরম ধর্ম্ম-জ্ঞান করিয়াছেন, এই ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া রাজাকে তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরে ধারণ করিতেন, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেন। মহানুভব বাদশাহ তাঁহার স্বধর্ম্মী মুছলমান ও বিধর্ম্মী হিন্দুগণকে এক চক্ষে দেখিতেন, একই নিয়মে উভয় জাতির আনন্দ ও বিষাদের অংশ গ্রহণ করিতেন, সাম্যের বিধি-নিষেধ সম্যগ্‌রূপে

পালন করিয়া নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ মহামহিমান্বিত শাহানশাহ বাদশাহ সমস্ত প্রজার প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। যোগ্যতার অনুরূপ প্রধান প্রধান রাজপদে হিন্দুগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং তাঁহাদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহ পরম শান্তিতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুছলমান বাদশাহের প্রীতির সম্ভার ও অন্তরের ভালবাসা হিন্দুগণের বিশ্বস্ততার প্রকৃষ্ট প্রতিদান। "এই দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কথার মধ্যে কি গভীর অর্থ, কি মহৎভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বিবরণ পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পালের "ফরওয়ার্ড" নামক পত্রিকায় (March 1933) প্রকাশিত ইসলাম নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে পাঠকগণের বোধগম্য হইবে।

কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত নাটক সিরাজদ্দৌলা পাঠ করিয়া মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাকে লিখিয়াছেন "ভাই গিরিশ, বিশ বৎসর বয়সে আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়াছিলাম, আর তুমি ৬০ বৎসর বয়সে সিরাজদ্দৌলা লিখিয়াছ। আমি বিদেশী ইতিহাসে সিরাজকে যেভাবে পাইয়াছি, সেইভাবে চিত্রিত করিয়াছি; কিন্তু তুমিই সিরাজের খাঁটি নিখুঁত চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছ। অতএব তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান্।"

আমাদের দেশে বহুতর বিশিষ্ট প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে মুছলমানের রাজত্বকালে মুছলমান ধন-ভাণ্ডার হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ-কল্পে কি সংস্কার করিবার জন্য হিন্দুস্থানের মুছলমান সম্রাট্ অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, আর সেই সব ধর্ম্ম মন্দিরের স্থায়িত্বকল্পে জায়গীর বৃত্তি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। **অনেক স্বার্থপর ঐতিহাসিকের কাল্পনিক চিত্রে অঙ্কিত সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের**

বিকৃত চিত্র দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি, হিন্দুদ্বেষী এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ বলিয়া তাঁহার প্রতি অনেক লোক অশ্রদ্ধাভাব পোষণ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ বারাণসীধামে গমন করেন আর দেবালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের নিকট পুরুষ পরম্পরায় রক্ষিত ফারমান্ দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন যে, এই হিন্দুদ্বেষী বাদশাহ আওরঙ্গজেব হিন্দুমন্দিরসমূহের রক্ষাকল্পে এবং দেবপূজার আবশ্যকীয় ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য জায়গীরস্বরূপ প্রচুর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত ফারমান্ এখনও পুরোহিতগণের নিকট অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকার কাশ্মীর প্রদেশে বহু হিন্দু দেবালয় রক্ষার্থ এবং তাহাদের স্থায়িত্বকল্পে বাদশাহকর্ত্তৃক যে সমস্ত ভূমি ও বৃত্তি দান করা হইয়াছে, তত্রত্য ফারমান্ দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশ ফারমানে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা একবার অনুগ্রহ করিয়া পণ্ডিত-প্রবর খাজা কামালউদ্দিন কৃত Islam and Civilization নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন প্রজার ধর্ম্মরক্ষার্থ তিনি কিরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন এবং হিন্দুর মন্দির রক্ষার্থ কত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা উক্ত সম্রাটের ঘোষণা-বাণী উদ্ধৃত করিলাম, "প্রজার মঙ্গলের জন্য স্বাভাবিক করুণভাব প্রণোদিত হইয়া সকল প্রজাগণের জ্ঞাতার্থ আমরা এতদ্দ্বারা এই ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া আদেশ করিতেছি যে, আমাদের উচ্চ নীচ সকল প্রজাবর্গ শান্তির সহিত পরস্পর একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করিবে এবং এছলামের শরিয়ত অনুসারে আমরা এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি যে হিন্দুদিগেরও পৌত্তলিক উপাসনালয়সমূহের তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করা হইবে। যেহেতু

ইদানীং আমাদের গোচরীভূত করা হইয়াছে যে কতিপয় লোক আমাদের বারাণসী ধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগণের সহিত অপমানজনক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে এবং ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের প্রাচীন ন্যায়সঙ্গত উপাসনা-প্রণালীতে বাধা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছে এবং যেহেতু ইহাও আমাদের গোচরীভূত করা হইয়াছে যে এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে তাহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট, ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব আমরা এই ফারমান্ জারি করিতেছি এবং ইহা আমাদের সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জানাইয়া দেওয়া হউক যে, এই ফারমান্ জারি হইবার তারিখ হইতে কোন ব্রাহ্মণকে যেন তাহার উপাসনায় কোনপ্রকার কষ্ট কি বাঁধা প্রদান করা না হয়। আমাদের হিন্দু প্রজাগণ শান্তির সহিত বাস করিয়া যেন আমাদের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন (Islamic Review April and May 1925.)।)

সম্রাট্ নাছিরুদ্দিন বাদশাহের অতুলনীয় ত্যাগে ও মহত্বে, পরোপকারিতায় ও দানশীলতায়, ন্যায়পরায়ণতায় ও সমদর্শিতায় অভিভূত হিন্দুগণ তাঁহাকে পৌরাণিক-যুগের আদর্শ মহাপুরুষ প্রজাবৎসল রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিতেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহামহিমান্বিত বাদশাহ নিজের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দ্বারাই কোনপ্রকারে তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কথিত আছে, সাম্রাজ্ঞী একদিন রন্ধন করিবার সময় আপনার করাঙ্গুলি দগ্ধ করিয়াছিলেন, স্বামীকে ক্ষত স্থান দেখাইয়া ম্লানমুখে অভিযোগ করিলে, দীনজন-পালক দিল্লীশ্বর দুঃখিতান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন, "এছলামের আদর্শে বাদশাহ তাঁহার দীন প্রজা হইতেও দীন, রাজভাণ্ডার হইতে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিবার অধিকার তাঁহার নাই, সুতরাং তিনি কোথায় অর্থ পাইবেন

যে, একজন সূপকার রাখিয়া রাজ্ঞীর ক্লেশ অপনোদন করিতে পারেন।”

আমাদের দুর্ভাগ্য, আজ আমরা ভারতের দুইটি প্রধান জাতি হিন্দু ও মুছলমান পরস্পর প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া একের ধর্ম্মমন্দির অন্যে কলুষিত করিতে এবং তাহা ভূমিসাৎ করিতে কত চেষ্টা, কত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, একের ধর্ম্মের গ্লানি ও কুৎসা প্রচারিত করিয়া কত তৃপ্তি অনুভব করিতেছি, ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া এক ভাই আর এক ভাইয়ের মাথায় লাঠি মারিতেছি, মিলনের পবিত্র সূত্র ছিন্ন করিয়া কলহ, বিবাদ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া অধঃপতনের নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছি।

এছলামে প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ

এছলাম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রাজা ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ছিল। এছলামের উদার নীতি মনুষ্য-জীবনের সর্ব্ববিভাগে যেমন সভ্যতা ও স্বাধীনতার আলোক বিস্তৃত করিয়াছিল, তেমনি ভৃত্যগণেরও অন্তর মধ্যে স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। তখন হইতে ভৃত্যবর্গ তাহাদের প্রভুর সহিত চুক্তি করিয়া তাঁহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত অর্থাৎ পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহার মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া সে তাহার প্রভুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। কোন অত্যাচারী মনিব যদি তাহার ভৃত্যের সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন, তাহাকে প্রহার করিতেন, সময় মত তাহার বেতন না দিতেন, তাহা হইলে ভৃত্য প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিত এবং প্রভুকে তাঁহার অবৈধ কার্য্যের জন্য বিচারপতির প্রদত্ত শাস্তি অবনতমস্তকে বহন করিতে হইত। হজরত মোহাম্মদ আবির্ভূত হইবার পর যখন দেশের সর্ব্বত্র সাম্যবাদ প্রচারিত হইল, তখন তাহারাও মনুষ্যত্বের দাবী করিয়া মনুষ্য-সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মনেপ্রাণে বুঝিতে পারিল যে, তাহারাও সেই করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানব, মূকের মত পাশবিক নির্য্যাতন, নির্ম্মম অত্যাচার, নিষ্ঠুর পীড়ন সহ্য করিতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভৃত্যবর্গ মনুষ্য-সমাজে মনুষ্য নামে অভিহিত হইত না, সৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের মত তাহাকে সর্ব্বদাই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে হইত, কঠিন

নির্য্যাতনে তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, অভিশপ্ত জীবের মত সহস্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত দেহে সে কেবল ঊর্দ্ধনেত্রে করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করিত, প্রতিকারের জন্য কোন মানবের নিকট আবেদন করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। সেই মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (করুণাময় আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁহার পবিত্র স্মৃতি অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হউক) একদিন তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহার নিজের অন্তরের সহিত অপরের অন্তরের তুলনা করিতে পারে, সে-ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-ভাজন হয়। কোন প্রভু তাঁহার ভৃত্যকে এরূপ কর্ম্মভার না দেন, যে ভার তিনি নিজে বহন করিতে অক্ষম। ভৃত্য দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিতে প্রত্যেক মনিবের সেই ভৃত্যকে আহ্বান করা অথবা সেই খাদ্যদ্রব্যের কিয়দংশ তাহার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। কোমল হৃদয় মহানবী দুঃখীর দুঃখ সর্ব্বান্তঃকরণে বুঝিতে পারিতেন, তাই তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রমিকগণের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। এছলাম গবর্ণমেণ্ট শ্রমিক-গণের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন এবং তাহাদের প্রতি অত্যা-চারের প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ-সংরক্ষণে এছলামের উদারনীতি প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করা উচিত। এক সাম্যবাদের উপর এছলামের সমস্ত বিধি প্রতিষ্ঠিত, আর এই সাম্যবাদের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এছলাম সমস্ত পৃথিবীতে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছে যে, সমস্ত মানব সেই এক অদ্বিতীয় মহান্ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এই যে অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ চেতন কি অচেতন, মানবের কল্যাণার্থ মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত পদার্থে

সমস্ত মানবেরই তুল্য অধিকার। অপর দিকে এছলাম এই বিধিও প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, যে আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি করিয়া দেখিতেছেন কোন্ মানব কিরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম, আর কাহার কিরূপ কার্য্যকরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া যশ-মান-কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্-ধন, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সমাজে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাও মানবের স্বভাব ধর্ম্ম এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে উত্তেজিত করিতে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—

("তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সৎকার্য্যে একে অন্যকে অতিক্রম করিতে সচেষ্ট থাকিবে। কিন্তু সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ আল্লাহ্ সমস্ত মানবকে এক শ্রেণী ভুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, একই সৌভ্রাতৃ ভাবে পরস্পরে আবদ্ধ হইয়া এক অদ্বিতীয় মহান্ আল্লাহ্কে লক্ষ্য করিয়া সকলে নিজের নিজের শারীরিক মানসিক উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিবে। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার গূঢ় উদ্দেশ্য সকলেই যেন নিজের নিজের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট থাকে।" ৫ : ৪৮)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে বিশ্ববাসিগণের মধ্যে যাহারা আলস্য-পরায়ণ হইয়া গৃহে অবস্থিতি করে এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শ্রমবিমুখ হয়, আর যাহারা বীরের মত তাহাদের সমস্ত শক্তি আল্লাহ্র কার্য্যে (অর্থাৎ মানব সাধারণের মঙ্গলের জন্য) নিয়োগ করে, তাহারা কখনই একই প্রকার ফল প্রাপ্ত হইবে না। যাহারা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হইয়া অকুতোভয়ে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, মহান্ আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আর এই আসনের স্থিতি যাহারা অলস-ভাবে গৃহে অবস্থিতি করে, তাহাদিগের অনেক ঊর্দ্ধে। সকলকেই তিনি উত্তম প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। যিনি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তি

প্রয়োগ করিবেন, তিনিই যাহারা আলস্যপরায়ণ হইয়া গৃহে অবস্থিতি করে, তাহাদিগের অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপিত। আর তাহাদিগের অপেক্ষা উত্তম কর্ম্ম-ফল সেই মঙ্গলময় মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ৪ ঃ ৯৫

("হে বিশ্বাসিগণ, এক সমাজভুক্ত লোক যেন অন্য সমাজভুক্ত লোককে কোনপ্রকার ব্যঙ্গ কি বিদ্রূপ না করে। কালের আবর্ত্তনে ইহাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। পরস্পরের নিন্দাবাদ করিও না, আর পদবীগুলির সমালোচনা করিয়া একে অন্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিও না। বিশ্বাসের উপর আঘাত করিয়া অনাচারের সৃষ্টি করিও না। তাহার পরিণাম অতি মন্দ। যাহারা প্রতি-নিবৃত্ত না হয়, তাহারাই ন্যায় অতিক্রম করিয়া থাকে।" ৪৯ ঃ ১১)

পবিত্র কোরআনে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে আভিজাত্য গৌরবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কি অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এছলামের নীতিবিরুদ্ধ।

পবিত্র আত্মা মহাপুরুষ মোহাম্মদ বলিয়াছেন, আভিজাত্য-গৌরবে কাহারও প্রতি কোনপ্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে। তোমরা সকলেই সেই আদি পুরুষ আদমের সন্তান। একই ছাঁচে ঢালা দুইটি বস্তুর যেমন কোন প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না, সেইরূপ গোত্র কি বংশ ভেদে একের সহিত অন্যের কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ একই উপাদানে মহান্ আল্লাহ্ সমস্ত মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত ধর্ম্মভাব, সংযম, এবং চরিত্রের সৌন্দর্য্য ব্যতীত কেবলমাত্র বংশ-গৌরবে একের অপেক্ষা অন্যের অধিক মর্য্যাদা থাকিতে পারে না।

নরোত্তম নবী পুনরায় বলিয়াছেন, জাত্যাভিমানের স্থান এছলামে নাই। তাঁহারা যে বংশের কি যে দেশের লোক হউক না কেন, তাহারা

যদি চরিত্রবান্ এবং সংযমশীল হয়, তাহা হইলে তাহারাই আমার পরমাত্মীয়। মিথ্যা জাত্যাভিমান ত্যাগ করা সকলেরই উচিত। তাহার ব্যতিক্রম হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কৃমিকীটের মত লাঞ্ছিত করিবেন।

(“যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-পরায়ণ, সেই ব্যক্তিই মর্য্যাদাশীল। তোমাদিগের মধ্যে যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনিই তাঁহার নিকট সম্মানার্হ।” ৪৯ : ১৩)

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে তাহার ঐশ্বর্য্য-ধন-সম্পদ্ পদবী কি জাত্যাভিমান তাহাকে মর্য্যাদাশালী করিতে পারে না। নৈতিক চরিত্রে উৎকর্ষ লাভ করিয়া তাঁহার উপর ভক্তিমান হওয়াই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

প্রত্যেক মানবের ধনাগম তৃষা অতি প্রবল; কিন্তু জগতে সকল ব্যক্তিই তাহার কর্ম্ম-শক্তি ও প্রতিভার উপর নির্ভর করিয়া ধন উপার্জ্জন করিতেছে। এছলাম নির্দ্দেশ করিতেছে যাঁহারা এই প্রকারে সাংসারিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের অপেক্ষা হীন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, আর দুঃস্থ, বিপন্ন, উপার্জ্জনে অশক্ত, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য লোকদিগের জন্য তাঁহাদের ধনভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে করুণাময় আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় যাহা তুমি উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহা হইতে দুঃখিজনকে কিঞ্চিৎ বিতরণ কর, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিবে তোমার উপার্জ্জিত অর্থে দুঃখিগণেরও কিছু অংশ আছে। “দুঃখিজনে দয়া কর দাতা মহাশয়।” এই ভাব সকল ধর্ম্মের সার, কিন্তু এই মহা ধর্ম্ম-পুস্তকে এই ভাব যেরূপ উদারভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, মহানবী দানের উপর যেরূপ

গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, এই ভাবের অনুপ্রেরণা এছলাম ধর্ম্মাবলম্বি-গণকে যেরূপভাবে দয়ার সাগরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, এই ভাবের উচ্ছ্বাস যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাদের অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইয়াছে, এমনটি আর কোথাও নাই। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এই যে উত্তেজনা, পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য এই যে উত্তেজনা, ইহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্‌র অনুমোদিত এবং প্রত্যেকেরই তাহার সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিবার ধর্ম্ম ও ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে। এছলামিক বিধি অনুসারে যেমন প্রাকৃতিক বস্তু সকলে যথা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদিতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, তেমনি অবস্থা ভেদে প্রত্যেকেরই ঐশ্বর্য্যসম্পদে প্রত্যেকের অংশ আছে। ইহাই এছলামের সার্ব্বজনীনত্ব এবং ইহাই এছলাম প্রকৃতির উদার অভিনয়।

(পবিত্র কোরআনে লিখিত হইয়াছে, ধনবানগণের অর্থে যাহারা তাহা-দের অভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ এবং যাহারা তাহাদের অভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই তুল্য অধিকার আছে। ৫১ ঃ ১৯

(এই কয়টি বাক্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মুছলমানের চক্ষে বাক্যহীন মূক পশুপক্ষীও ঘৃণার পাত্র নহে এবং তাহারাও মুছলমানের নিকট আদরের পাত্র ও অবশ্য প্রতিপাল্য। নীচ এবং ঘৃণ্য এই কথা মুছলমান শাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হইবে না। অতি নিকৃষ্ট জীবও সেই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, সুতরাং মুছলমান তাহাকে রক্ষা করা কি পোষণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে। কথিত আছে দ্বিতীয় খলিফার পুত্র আবদুল্লাহ্ একদিন দেখিতে পাইলেন যে বালকগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র প্রাণী বন্ধন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের

এই হৃদয়হীনতায় বালক খলিফা-পুত্রের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি শুনিয়াছি হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন যে নিষ্ঠুরহৃদয় পশুগণকে এইরূপে বন্ধন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে অকারণে হত্যা করিবে, সে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের পাত্র হইবে।"

পবিত্র কোরআনে পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে, "তোমার আত্মীয়স্বজনবর্গকে, অভাবগ্রস্তকে এবং পথিকগণকে তাহাদের অধিকার অনুসারে ধন বিতরণ কর।" ৩০ ঃ ৩৮

এই শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে প্রভূত পরিমাণে অর্থসঞ্চয়ের অধিকার এছলাম জগতে কাহারও নাই। অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে অথবা এরূপভাবে হস্তান্তর করিতে হইবে যাহাতে অর্থের বিনিময়ে অর্থাগম হইতে পারে এবং সেই অর্থ দ্বারা যেন সাধারণ মানব সকল উপকৃত হয়। এইজন্য পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যাহারা দাম্ভিক ও অহঙ্কারী এবং যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করে আর তাঁহারই অনুকম্পায় উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহার নিকট গোপন করে, আল্লাহ্ সেই সমস্ত লোকদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহারা যদি এই অভ্যাস হইতে বিরত না হয় এবং আল্লাহ্‌র আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে অপমানজনক শাস্তি পাইবে। ৪ ঃ ৩৭, এছলামের অনুশাসনে কোন মানবের আত্মতৃপ্তির জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার নাই; শয়নে, ভোজনে, ভূষণে, গৃহনির্ম্মাণে মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক বিভাগে তাহাকে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ অনুশাসন ও বিধি থাকা সত্ত্বেও কোন কোন মনুষ্য কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করিয়াই তৃপ্তি উপভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য এছলামিক গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রজার উপর

শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে ট্যাক্স অর্থাৎ খাজনা ধার্য্য করিয়াছিল আর এই অর্থ কেবলমাত্র দুঃখী ও অভাবগ্রস্তের জন্য ব্যয় করা হইত। হজরত মোহাম্মদ এই ট্যাক্স ধার্য্য করিবার উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, জাকাত প্রত্যেক অর্থশালী লোক দিতে বাধ্য এবং অর্থশালী লোক ভিন্ন অপর কোন লোকের নিকট হইতে জাকাত আদায় করা হইবে না, আর এই অর্থ কেবলমাত্র দুঃখী লোকদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে দুঃখিগণেরও ধনবানের অর্থে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে এবং এই অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা কোনক্রমে সঙ্গত নহে। পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি, বাণিজ্য-সম্ভার ইত্যাদি হইতে জাকাত আদায় কর, তাহা হইলে সেই সব সম্পত্তির ও দ্রব্যাদির পবিত্রতা রক্ষা করা হইবে এবং তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর আর সেই প্রার্থনাই তাহাদের সান্ত্বনাপ্রদ হইবে। মহাপ্রাণ মোহাম্মদের করুণ হৃদয় দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া স্বভাবতঃই ভাঙ্গিয়া পড়িত। জাকাত প্রথা এ মরজগতে করুণাময়ের এক অতুলনীয় মঙ্গল বিধান। ইহার সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী মুগ্ধ হইত, ক্ষুধিত ব্যক্তিগণ ইহার স্বাদুতায় পরম তৃপ্তি উপভোগ করিত। ধনবান্ দরিদ্রকে এক প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করিবার উপায় জাকাত সংগ্রহ করা; ধনিগণ প্রাণে বিমল শান্তি ভোগ করিতেন যে তাঁহাদিগেরই অর্থে দরিদ্রগণ প্রতিপালিত হইতেছে আর দরিদ্রগণও রাক্ষসী ক্ষুধার তীব্র তাড়না হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আল্লাহ্‌র নিকট ধনিগণের জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে দোওয়া করিত।

এছলাম জগতে উন্নতির পথ সকলের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত। যিনি এই পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেন, তিনি সাধারণের এবং গবর্ণমেণ্টের

প্রশংসা লাভ করিতেন। হিংসা কি অসূয়া পরবশ হইয়া কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারিত না। যিনি এইরূপ নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেন, তিনি সাধারণের ঘৃণার্হ এবং গবর্ণমেণ্টের শাস্তির পাত্র হইতেন। জন্মগত অধিকারে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির উপব প্রাধান্য লাভ করিতে পারিত না। সকল মানবই সেই এক মহান্ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, এক ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একের দুঃখে অপরে দুঃখিত, একের বিপদে অপরে বিপদগ্রস্ত। প্রত্যেকের হৃদয়ে সহানুভূতির সুকোমল তন্ত্রী ভেদ করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস ছুটিত, মমতার স্নিগ্ধ সরসীহিল্লোলে শোকের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত।

সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুকম্পা, তাই মহাপ্রাণ মোহাম্মদের জন্ম। সমস্ত আরব কেন—সমস্ত পৃথিবীতে তখন যেন অগ্নিময় প্রভঞ্জনে অগ্নিকণা সঞ্চারিত হইতেছিল। সে অগ্নিতে মানবের সমস্ত সুকোমল বৃত্তি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল। অধর্ম্মের উত্তাপ উত্তপ্ত অঙ্গার সদৃশ আকাশে বাতাসে, প্রাদেশে প্রান্তরে সমাজে সংসারে সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছিল, কানন-কুন্তলা ধরণীর অপূর্ব্ব শ্রী, অভ্রভেদী শৈলমালার সুনীল প্রভা সমস্তই যেন পিশাচের আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়া অগ্নিবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তখন সেই মহান্ আল্লাহ্‌র অনুকম্পায় মহামানব অবতীর্ণ হইয়া শান্তির শীকর-সলিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন। হিংসা শতফণা বিস্তার করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিষ উদ্গিরণ করিতেছিল, সেই বিষের জ্বালায় মানবের সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছিল, মহাপ্রাণ মোহাম্মদ করুণার স্নিগ্ধ-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাদের সর্ব্বসন্তাপ দূর করিলেন, সমস্ত পৃথিবী যেন স্নিগ্ধ হইল। শয়তান শত বাহু বিস্তার করিয়া তাহার প্রভুত্ব স্থাপন করিল, ভাইয়ের বক্ষে ভাই ছুরি মারিতে লাগিল, মানবের জ্ঞানের দ্বার

রুদ্ধ করিয়া ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইল, মানব পৈশাচিকভাবে উত্তেজিত হইয়া যেন তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল, স্নেহ মমতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া নির্দ্দয় মানব তাহার স্নেহের দুলালী আত্মজাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইল না, সমাজে সংসারে সর্ব্বত্রই অত্যাচারের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মা মোহাম্মদের অনুকম্পায় মানব আবার তাহার মানবত্ব ফিরিয়া পাইল, পবিত্র শান্তির মধুর স্রোত আবার চারিদিকে প্রবাহিত হইল। করুণাময় আল্লাহ্, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির মর্য্যাদা যেন প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়।

মানবের নৈতিক জীবনে

এছলামের প্রভাব ও উদারতা

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—মানব সাধারণকে সৃষ্টিকর্ত্তা করুণাময় আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত করাই ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। এছলাম অতি সুন্দর ও সরলভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছে মানব যেন তাহার প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এবং তাহার সমস্ত সত্তা তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে। পবিত্র কোরআনে হজরতের কমলানন হইতে নিঃসৃত আল্লাহ্‌র বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সমস্ত জগতে সাম্যবাদ প্রচার করা আর বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ করা এছলামের মূল নীতি।

ধর্ম্মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যের ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত। যে মানব সেই মহান্ আল্লাহ্‌র গুণাবলি, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে স্বভাবতঃই তাহার সমস্ত অসৎপ্রবৃত্তি ও দুর্নীতি পরিহার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু যে মানব তাঁহার সত্যবাণীতে আস্থা স্থাপন না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজেকে যত দূরে রাখিবে, সে ততই দুর্নীতি-পরায়ণ এবং কদাচারী হইবে।

(পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, যে মানব অজ্ঞতা-প্রযুক্ত পাপাশ্রয়ী হইয়াছে, সে যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি নিশ্চয়ই তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবেন, কারণ তিনি যে প্রত্যেকের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন আর তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। ৪ : ১৭)

তিনি পরমকারুণিক ও তিনি নিত্য ক্ষমাশীল, তাই তিনি তাঁহার করুণার শ্রেষ্ঠ অবদান, তাঁহাব ক্ষমার প্রকৃষ্ট পরিচয়, তাঁহার আদেশ ও উপদেশবাণী মানব-সমাজে প্রচারার্থ তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া মানব-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবীর মানবকে সত্যপথে চালিত করা সেই মঙ্গলময়ের মহৎ উদ্দেশ্য, অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে আর যেন কেহ আচ্ছন্ন না থাকে। তবুও যদি মানব অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অসৎপথাশ্রয়ী হয়, অনুশোচনা করিলে তাহাকেও তিনি ক্ষমা করিয়া থাকেন। তাঁহার চিত্ত সতত প্রেমপ্রবণ, তাই তিনি সর্ব্বদা তাঁহার প্রেমের ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছেন, যেন সেই ধারায় অভিষিক্ত হইয়া মানব তাহার সর্ব্বসন্তাপ দূর করিতে পারে। ইহাতেই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, এছলামের উদারতা পৃথিবী ব্যাপ্ত, আর ধর্ম্মের ইতিহাসে এরূপ উদারভাবের পরিচয় কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না।

সেই মহান্ আল্লাহ্ যেমন করুণাময়, তেমনি সদ্বিচারক। যে সকল দুর্বৃত্ত তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া জগত-সংসারে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহারা পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু তাহারা কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়া যখন তাঁহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখন তাহারা কলঙ্কমুক্ত চন্দ্রের মত মুক্ত দ্বারপথে স্বর্গে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই শাস্তি তাঁহার করুণার নিদর্শন, যেমন অবাধ্য সন্তানকে সৎপথে আনিবার জন্য তাহার স্নেহশীল পিতা শাস্তি দিয়া থাকেন। তখন তাহার পবিত্র আত্মা তাঁহার দিব্য রশ্মি গ্রহণ করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার সদ্বিবেচনা, সদ্বিচার এবং অনন্ত কৃপা সূচিত হইতেছে।

পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে মানবের

নৈতিক জীবনে যে সমস্ত গুণাবলি প্রস্ফুটিত হইলে তিনি সংসারে এবং সমাজে আদর্শ মানব বলিয়া গৃহীত হইতে পাবেন। ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, রাজভক্তি, প্রত্যয়, মিতাচার, সত্যানুরক্তি, সত্বসংশুদ্ধি, স্বাধ্যায়, আল্লাহ্‌র প্রতি আসক্তি প্রভৃতি গুণাবলি যদি কোন মানবের নৈতিক জীবনে সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আদশ পুরুষ বলিয়া জগতের লোক তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, সৃষ্টিকর্ত্তা মাত্র একজন মানবকে এই সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত করিয়া এই মরধামে পাঠাইয়াছিলেন। তাই তিনি এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত ন্যায়নিষ্ঠ সুধীজনের নিকট মহামানবরূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছেন, তাই সমস্ত জগতের অর্দ্ধেকেরও উপর লোক তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিয়া প্রাণে নির্ম্মল শান্তি উপভোগ করিয়া থাকে। এছলামের শিক্ষার সৌন্দর্য্য প্রত্যেক মানবকে এই সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে আল্লাহ্‌র পথে আকৃষ্ট করে।

এছলাম নির্দ্দেশ করিতেছে, কোন লোকের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া কি দ্বেষ, আক্রোশ, কি ক্রোধ বশতঃ কখনও ঘৃণা পোষণ কি প্রকাশ করিবে না। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে আমরা তাহাদের বক্ষ (অন্তর) হইতে ঘৃণা কি বিদ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিব, যাহাতে তাহারা পরস্পরে হৃদয়ে পবিত্র ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতে পারে। শান্তির পবিত্র সলিলে স্নাত মানবের হৃদয়পট হইতে যখন দুষ্প্রবৃত্তির সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া যায়, তখন তাহার নির্ম্মল অন্তরে পবিত্র ভ্রাতৃভাব স্বভাবতঃই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন স্বার্থগন্ধহীন তাহার অন্তর ভেদ করিয়া করুণার উচ্ছ্বাস ছুটিয়া যায়, সমস্ত বিশ্ব সেই করুণার স্রোতে প্লাবিত হয়, তখন মহান্ আল্লাহ্‌র

প্রেমের পীযুষধারা আকণ্ঠ পান করিয়া মানব ভোগৈশ্বর্য্যের সমস্ত তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, জ্ঞানের দ্বার মুক্ত করিয়া করুণ মধুর কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করাই তখন তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, তখন—

তুমি ভালবাসিবে বলে আমি ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥

—নিধু বাবু

(মহাপ্রাণ মহানবী বলিয়াছেন মুছলমান কখনও কাহাকে ঘৃণা করিবে না কিংবা তাহার অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিবে না। একমাত্র তিনিই শাস্তি প্রদাতা, যিনি এই চরাচর সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত প্রাণীরই তিনিই একমাত্র প্রভু (মালেক) এবং সমস্ত মানবই তাঁহার পরিচারক (বান্দা)। তিনি সর্ব্বদাই স্নেহময়, করুণাময়, প্রেমময়। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "আমার বান্দাগণকে সংবাদ দাও যে আমি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।" ১৫ঃ ৪৯)

এ সংসারে মায়া ও ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া মানব কুপথে পদার্পণ করে, এইরূপে পথভ্রষ্ট যাহারা, তাহারাই প্রভুর করুণায় বঞ্চিত হইবে, অপর কেহই নহে।

পবিত্র কোরআনে অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, একমাত্র সেই মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্ট মানবকে শাস্তি দিতে পারেন, যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন দুষ্কৃতকারীকে যদি ক্ষমা করা যায়, তাহা হইলে সে ক্ষমার অপব্যবহার করিবে। প্রাণে যখন বড় ব্যথা পাইবে, হিংসার শাণিত কৃপাণ যখন তোমার মস্তকোপরি উত্তোলিত হইবে, যখন প্রবল শত্রু তোমাকে নির্য্যাতিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে, তখন তুমি তোমার সমস্ত প্রাণমন তাঁহাতে সমাহিত করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে,

আর তাঁহারই নিকট সেই অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিবে, ইহাই এছলামের নীতি। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—

("হে স্বর্গ ও ধরণীর অধীশ্বর, আমার জীবনের এইপারে এবং পরপারে তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক। আমার আত্মা, দেহ, মন, আমার বলিতে এই পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সমস্তই তোমাতে সমাহিত হয়ে আমার এই মাটির দেহ যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। হে প্রভু, আমি যেন সত্যপথাশ্রয়ীর সহিত সংযুক্ত হইতে পারি।" ১২ঃ১০১)

কত বড় অনুরাগ, কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা, কত প্রেম, প্রতি অক্ষরে শ্রদ্ধার ভাব, ভক্তির ভাব, প্রেমের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ণনার মাধুর্য্যে প্রাণ-মন মুগ্ধ হয়, যেন সহস্রদল বিকশিত কমলিনী, সৌন্দর্য্যে সমস্ত জগত মুগ্ধ করিতে, সুগন্ধে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যত বড় পাষণ্ড হউক না কেন, কোরআনে বর্ণিত এই শ্লোকটি যদি একবার মাত্র তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহার কঠিন অন্তরে নিশ্চয়ই আঘাত লাগিবে। তাহার হৃদয় মধ্যে প্রজ্জ্বলিত প্রতি-হিংসার অনল ক্ষণিকের জন্যও নির্ব্বাপিত হইবে। মোহের আবরণে রুদ্ধ বিবেকের দ্বার মুহূর্ত্তের জন্যও মুক্ত হইবে, আর যদি সেই মুক্ত দ্বারপথে একবার মাত্র জ্ঞানের রশ্মি তাহার অন্তর মধ্যে প্রতিভাত হয়, তখন মোহের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হইবে। এছলাম এই জ্ঞানের রশ্মি সমস্ত জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার জন্য চিরদিনের জন্য প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে।

প্রতিহিংসা মানবের অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথও অসংখ্য। এই প্রবৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত মানবজগতে এমন কোন অসৎকর্ম্ম নাই যাহা না করিতে পারে। কিন্তু এই উত্তেজনা-স্রোত প্রতিহত করিয়া যদি আপনাকে সে জ্ঞানমার্গে চালিত করিতে

পারে, তাহা হইলে তাহার নৈতিক চরিত্র বিকসিত হইয়া উঠে, সে তখন সংসারে সমাজে সকলেরই প্রশংসার পাত্র হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রবৃত্তির স্রোত প্রতিহত করিতে এছলাম নির্দ্দেশ কবিতেছে—"যে ব্যক্তি তোমার উপর যতটুকু অত্যাচার করিবে, তুমি তাহার প্রতি ততটুকু অত্যাচার করিবে। কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ রহিবে এবং মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্‌ সত্যাশ্রয়ীর সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত।" ২ঃ ১৯৪। তোমার আততায়ী, কি শত্রু যে কেহ হউক না কেন, তোমার প্রতি সে যে-পরিমাণ অত্যাচার করিয়াছে, তুমিও তাহার প্রতি সেই পরিমাণে অত্যাচার করিতে পার। এক ব্যক্তি তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তোমার অঙ্গে ব্যথা বাজিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রহার করিতে পার ; কিন্তু মনে রাখিবে তোমার অঙ্গে যে পরিমাণে ব্যথা বাজিয়াছে, তাহার অঙ্গে যেন সেই পরিমাণে ব্যথা বাজে। কোরআনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী একটু অধিক ব্যথা বাজিলে তোমাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে। ইহা যেন ওজন করিয়া প্রহার করা। যেমন Merchant of Venice এ এক পাউণ্ড মাংস কাটিতে হইবে, একটু অধিক কি একটু অল্প না হয় এবং একবিন্দু রক্ত না পড়ে। সুতরাং এছলাম প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে নির্দ্দেশ করিতেছে, তুমি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে সেই বড় আদালতের আশ্রয় লও। আল্লাহ্‌র প্রতি এ বিষয়ে তোমার কি কর্ত্তব্য ? পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—"যদি তুমি প্রকাশ্যে সৎকর্ম্ম কর, অথবা গোপনে সৎকর্ম্ম কর অথবা মন্দের পরিবর্ত্তে ক্ষমা করিতে পার, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করিবেন, তিনি যে শক্তিশালী।" ৪ঃ ১৪৯। অতএব তুমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিচয় না দিয়া অর্থাৎ প্রতিহিংসাপরায়ণ না হইয়া অত্যাচারীকে ক্ষমা করিবে, তাহা হইলে তিনিই তাহার বিচার করিবেন।

এমন সূক্ষ্ম বিচারক আর কে আছে, তাঁহার কাছে অভিযোগ করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার কারণ তিনি যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচারক। যখন সৃষ্ট জীব সকলেই তাঁহার সন্তান তুল্য স্নেহের পাত্র, তখন তিনি কি করিয়া অবিচার করিবেন?

পবিত্র কোরআনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মছলমানকে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য-চালিত হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া তাহারা কর্ত্তব্যকে যেন তাহাদের নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া মনে রাখে। মহাধর্ম্ম পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা আছে যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে তাহার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য ক্ষমা করিতে পারে, আল্লাহ্ তাহাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিবেন, কিন্তু অত্যাচারীকে তিনি কখনও ভালবাসেন না। হে মনুষ্যগণ, যাহা কিছু তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহাই তোমাদিগের পার্থিব জীবনের সুখের উপাদান স্বরূপ। কিন্তু সেই মহান্ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল বিশ্বাসিগণের জন্য যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা অত্যুত্তম এবং চিরস্থায়ী। যাহারা লজ্জাকর এবং পাপজনক কার্য্য হইতে বিরত থাকে, ক্রুদ্ধ হইলেও ক্ষমা করিয়া থাকে এবং পরম প্রতিপালক আল্লাহ্‌র আজ্ঞা পালন করে, আর যাহারা নিয়মিত উপাসনা (নমাজ) করে, করণীয় কার্য্যে পরস্পরের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে, আমারই (আল্লাহ্‌র) প্রদত্ত অর্থ হইতে সৎপাত্রে দান করে, শত্রুতাচরণকারীকে সীমা অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মুক্ত হইয়া প্রতিফল প্রদান করে, তাহাদিগের কোন প্রকারে তাঁহার নিকট দণ্ডিত হইবার আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু যিনি ক্ষমাগুণে ভূষিত হইয়া শত্রুগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারেন, তিনিই নিঃসন্দেহে তাঁহার নিকট পুরস্কারপ্রাপ্ত হইবেন। যাহারা মনুষ্য সাধারণের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে

অশান্তি বিস্তার করে, তাহাদিগের জন্যই মহাশাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরন্তু যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করিয়া ক্ষমা করিতে পারে, তাহার কার্য্যই মহৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ৪২ঃ ৪০-৪৩)

কর্ম্মক্ষেত্রে মুছলমানকে কিরূপ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার নিজের সন্তান-সন্ততি, সহধর্ম্মিণী, প্রতিবাসী, দেশবাসী এবং সমস্ত মানবের প্রতি তাহার কি কর্ত্তব্য তাহার সমস্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে এবং মহাপুরুষের অমৃতনিস্যন্দিনী বাণীতে (হাদিসে) অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মুছলমান সমাজে অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তি যদি মনে করেন, অত্যাচারীকে ক্ষমা করিলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইবে, তখন ক্ষমা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, আর যদি তিনি মনে করেন ক্ষমা করিলে দুষ্কৃতকারী ক্ষমার অপব্যবহার করিবে এবং তাহার চরিত্র সংশোধিত হইবে না, তখন তাহাকে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য। সংসারে শান্তি অব্যাহত রাখিতে এছলাম যে বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা ধর্ম্মের অনুশাসনে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। এছলাম কাহাকেও উৎসাহিত করিতেছে না যে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দাঁতের পরিবর্ত্তে দাঁত, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু উৎপাটিত করিয়া লইবে, কিম্বা তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে তোমার বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিবে, কিম্বা যে তোমার 'কোটটি' অপহরণ করিবে, মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে তাহাকে তোমার 'ক্লোকটি' (বড় কোটটি) দান করিবে। ক্ষমার তুল্য উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি মনুষ্য-জীবনে আর নাই, এছলাম হজরত মোহাম্মদের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণের চরিত্রে ক্ষমার আদর্শ জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিয়াছে ক্ষমার অপব্যবহার করিও না, দুষ্কৃতকারীকে ক্ষমা করিলে যদি তাহার চরিত্র সংশোধিত হয়, এবং তাহার দ্বারায় সংসারের, সমাজের উপকার সাধিত হয়, তখন ক্ষমার

তুল্য গুণ আর নাই, কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া যদি তাহার চরিত্র সংশোধিত না হয়, যদি সে অধিক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সংসারের সমাজের আরও অপকার সাধন করে, তখন তাহাকে শাস্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য। এইক্ষেত্রে শাস্তি দিবার সময় পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অর্থাৎ "যতটুকু অত্যাচার করিয়াছে, ততটুকু অত্যাচার করিবে," ইহা মনে রাখিয়া দুষ্কর্ম্মান্বিতকে শাস্তি দিবে। কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইয়া কেহ এই প্রকার শাস্তি দিতে পারে না। ক্রোধ মানবকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে, অপ্রকৃতিস্থ হইলেই মানব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। এছলাম প্রত্যক্ষে শিক্ষা দিতেছে কর্ত্তব্যপরায়ন হও, আর পরোক্ষে শিক্ষা দিতেছে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের আহ্বানে শান্ত-সংযত চিত্তে দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিবে; যে শাস্তি সমাজের কল্যাণকর হইবে।

অনেকে মনে করেন, এছলাম ধর্ম্মের অনুশাসন মুছলমানকে প্রতিহিংসা লইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। পবিত্র কোরআনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে "সেই মহান্ আল্লাহ্ পরম কারুণিক এবং নিত্য ক্ষমাশীল।" মুছলমানগণকে অবিরত উৎসাহিত করা হইয়াছে "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ কর।" হজরত মোহাম্মদ শান্তির অগ্রদূত হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মানব-জীবনে যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহাই তাঁহার আজীবনের শিক্ষা। তাঁহার সমস্ত জীবনে, তাঁহার স্বভাবে, চরিত্রে, আচারে, ব্যবহারে সর্ব্বরকমে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন এবং লোক-চক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এছলাম শান্তির অমৃতময় উৎস।

(হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা একজন অপর একজনকে দেখিয়া কদাচ

বিদ্রূপ কি ঘৃণাবশতঃ হাস্য করিবে না। হয়ত সেই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হইতে পারে। কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোকের প্রতিও এই প্রকার হাস্য করিবে না, কারণ সেই স্ত্রীলোক হয়ত তাহার অপেক্ষা অধিক গুণশালিনী হইতে পারে। তোমাদের মধ্যে কাহারও কার্য্যে দোষারোপ করিবে না এবং কাহাকেও উপনামে সম্বোধন করিবে না; কারণ ইহাতে তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। ৪৯ঃ ১১)

(হে বিশ্বাসিগণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ চিত্ত, কি সন্দেহের বশীভূত হইবে না; কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ হইতে পাপোদ্ভব হইতে পারে। কখনও গুপ্তচরের মত অবস্থিতি করিবে না, কিম্বা কোন লোকের অন্তরালে তাহার নিন্দা করিবে না। ৪৯ঃ ১২)

মানব-চরিত্রে এই প্রকার নিকৃষ্টভাব বহুস্থানে দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ সভ্য জগতে এই প্রকার নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় সৰ্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইবে। ঐশ্বর্য্যশালীর চিত্ত এই প্রকার দোষে নিত্য কলুষিত, কারণ তাহাদের কৰ্ম্মহীন জীবন সর্ব্বদা পরচর্চ্চায় এবং পরনিন্দায় অতিবাহিত হয়। এছলামের নীতি অনুসারে এই প্রকার পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা পাপের কার্য্য। উৎপীড়িত ব্যক্তি যদি প্রতিকারে অসমর্থ হয়, এছলাম নির্দ্দেশ করিতেছে যে ব্যক্তি এইরূপ নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া প্রকাশ্যদ্বারে অভিযোগ করিবে। কিম্বা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিবে, যাহার দৃষ্টির অন্তরালে মানবের কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির মর্য্যাদা, কি সম্ভ্রম হানি করা এছলামের নীতি-বিগর্হিত। (এছলামের শিক্ষার মূল-ভিত্তি সমস্ত মানবকে নিজের মনের মধ্যে দেখিবে অর্থাৎ নিজের মনের দ্বারে যেরূপ আঘাত লাগে, অপর লোকেরও সেইরূপ আঘাত লাগিতে পারে। এছলাম

ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও ইহার সর্ব্বজনীনত্ব এই প্রকার কার্য্যের দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে, মানব যেন তাহার প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে তাহার অনুভূতির দ্বার মুক্ত রাখে, যেন তাহার কোন কথায়, কি কোন কার্য্যে কোন মানবের প্রাণে আঘাত না লাগে। মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, মানব নিজে যাহা ভালবাসে এবং যাহা পাইতে অভিলাষ করে, অপরের জন্য সেই প্রকার ভালবাসা এবং অভিলাষ প্রকাশ করিতে যতক্ষণ সে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার বিশ্বাসের (ঈমানের) পূর্ণতা মহান্ আল্লাহ্‌র বোধগম্য হইবে না এবং বাক্যে, মনে ও কার্য্যে এমন কি পরিহাস ও বিদ্রূপের মধ্যেও সে যেন মিথ্যা অর্জ্জন না করে।

আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান, পরস্পর ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ। এই নীতি এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা বিশ্বমানবের মধ্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ সর্ব্বপ্রকার ভেদনীতির মূলে এছলাম কুঠারাঘাত করিয়াছে, সমস্ত বিশ্বে এক অমৃতধারা, ভ্রাতৃ-প্রেমের অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছে, সেই পবিত্র প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত হইয়া মানব যেন হিংসা দ্বেষ, কলহ বিবাদ সমস্ত অপকৃষ্ট ভাব তাহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে। আলস্য ও জড়তার পথ রুদ্ধ করিতে এছলাম সকল মানবকেই উৎসাহিত করিয়াছে। যিনি তাঁহার কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, তিনিই বিশ্বপতির নিকট শ্রেষ্ঠ এবং মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইবেন। ৪ ঃ ৯৫

মানব জাতির আচারে, ব্যবহারে, অভ্যাসে যত কিছু বৈষম্য থাকুক না কেন, তাহারা যে কোন জাতি, কি যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, তাহাদের বর্ণগত যত কিছু পার্থক্য থাকুক না কেন,

সমস্ত মানবকে এক প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃত্বের পবিত্রভাবে উদ্বুদ্ধ করাই এছলামের মহান কর্ত্তব্য। মানবের কর্ম্মমার্গ অসংখ্য, তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে মার্গে চালিত করুক না কেন, তাহার লক্ষ্য এক—সেই মহান আল্লাহ্; লক্ষীভূত বিষয়ও এক—মহান আল্লাহ্‌র প্রীতি উৎপাদন।

উৎপীড়কের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করা উৎপীড়িতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি চালিত হইয়া মানব তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। এছলাম কিন্তু এই নীতির সমর্থন করে না। এই সম্বন্ধে নরোত্তম নবী উপদেশ দিয়াছেন, তিন দিবসের অধিক কোন মুছলমান যেন তাঁহার মুছলমান ভ্রাতার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ না রাখেন। এছলাম ধর্ম্মের উদারতার তুলনায় এই তিন দিবসও যেন অনেক অধিক সময়। মুছলমানের প্রাণ এরূপ উদার এবং তাঁহার ধর্ম্মের অনুশাসন তাঁহাব অন্তরকে এরূপ উদারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে যেন সে অন্তরে কোন প্রকার কালির দাগ পড়িতে না পাবে। যদিও বা ভ্রমবশতঃ পড়ে, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পাবে না। তাহার অন্তরের প্রতি স্তরে সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, সে সেই মহান আল্লাহ্‌র সেবক এবং সমস্ত মানবও তাঁহার সেবক। সুতরাং ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বিদ্বেষ, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ক্রোধ কি করিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। এছলামের মহত্ত্বের অনুভূতি এবং এই সত্য সনাতন ধর্ম্মের নীতিশিক্ষা তাহার অন্তরকে এরূপ কোমল করিয়াছে যে তাহার ভ্রাতার অন্তরে অতি সামান্য আঘাত লাগিলে সে আঘাত সে তাহার নিজের অন্তরে বোধ করিবে।

কোর-আনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণী—মুছলমান যেন তাঁহার উপকারী বন্ধু কিংবা আত্মীয়গণের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকেন এবং

কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের উপকার স্মরণ করেন। বর্ত্তমানে যে উপকার পাইতে পারি, কি ভবিষ্যতে যে উপকার পাইব এই আশায় অনেকে তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রকার লোককে তোষামোদকারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য অতীতের কার্য্যাবলি স্মরণ করিয়া উপকারীকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করাকেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বলা যাইতে পারে। অসময়ের অতি সামান্য উপকারের বিনিময়ে সুসময়ে তাহার চতুর্গুণ দান করিলেও তাহা পরিশোধ করা যায় না। নিজের অপত্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন মানবের প্রকৃতি-জাত-গুণ, কিন্তু পিতামাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করা নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন। পিতামাতা সন্তানের বাল্যজীবনে কত ত্যাগ, কত কষ্ট করিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া সন্তানের তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের সহিত কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত, সেই জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাদের পরিণত বয়সে তাঁহাদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি দান করা পুত্রের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। পিতামাতার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়, এছলাম শাস্ত্রে তাহা অতি বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(মহামানবের প্রফুল্ল বদন হইতে ঐশী-বাণী নির্গত হইয়াছে—"হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা সত্যপথাশ্রয়ী হইবে, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে, কোন জাতির প্রতি, কি কোন লোকের প্রতি ঘৃণাবশতঃ অবিচার করিবে না, সর্ব্বত্র সুবিচার করিবে, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ় নিশ্চয় হইবে! ৫ : ৮)

কি উদার, মহৎভাব এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে! এছলাম

প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে বলিতেছে মুছলমানের শত্রু নাই, যে ব্যক্তি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শত্রুর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারে, এ পৃথিবীতে তাহার কি কোন শত্রু থাকিতে পারে? শত্রু—সেও ত সেই বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি, তোমাকে তিনি যে উপাদানে গঠিত করিয়াছেন, তোমার শত্রুকেও তিনি সেই উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট—মনোবৃত্তি দুই প্রকার; তুমি তাহার উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে তাহার মূল দেশে প্রেমের রজত ধারা সিঞ্চন করিলে, আর কি তাহা বিকসিত না হইয়া থাকিতে পারে? তাহার তমসাবৃত হৃদয় সত্যের আলোকে প্রদীপ্ত করিয়াছ, কাহার সাধ্য সে আলোক নির্ব্বাপিত করিতে পারে? সত্য অতি সুন্দর, অতি মধুর, সুতরাং সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। মনের কুটিলতা, অন্তরের গ্লানি শঠতার আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া মুছলমান মিত্রতা স্থাপন করে নাই, তাহার শরৎ-চন্দ্রিকার মত শুভ্র হৃদয় দান করিয়া শত্রুকে মিত্র করিয়াছিল। সে সত্যের দ্বার মুক্ত করিয়া শত্রুকে দেখাইতে পারিয়াছিল যে, তাহার আবাল্য শিক্ষা সে ছলনায় অভ্যস্ত নহে। এছলাম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, পবিত্র কোরআনে সত্যমঙ্গলময় মহাপ্রভু প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে, প্রতি অক্ষরে সত্যের জয় ঘোষণা করিয়াছে। সত্যপথাশ্রয়ী মুছলমান সেই জন্য জগত জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল।

এছলাম ধর্ম্মাবলম্বীর শত্রুতা কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে—"তুমি যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছ, তাহার সহিত মিত্রতা-স্থাপনের উপায় স্বয়ং আল্লাহ্ই করিয়া দিতে পারেন, কারণ তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্, পরম দয়ালু ও নিত্য ক্ষমাশীল।" ৬০ : ৭

তোমরা ধর্ম্মানুরক্তির জন্য তোমার বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, এবং তোমাকে তোমার গৃহ হইতে বিতাড়িত করে নাই, তাহাদের

সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিতেছেন না, এবং তুমি তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে এবং সদ্বিচার করিবে। ৬০ঃ৮

কোন লোকের সহিত চিরদিনের জন্য শত্রুতা করা এছলামের নীতি-বিগর্হিত। কর্ত্তব্যের আহ্বানে আত্ম-রক্ষার্থে মুছলমানগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ স্থগিত হইবার পর মুহূর্ত্তে সেই সব শত্রুগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহারা মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবিশ্বাসিগণের উপর নির্ভর করিও না, অগ্নি তোমাকেও স্পর্শ করিবে। ১১ঃ১১৩

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে তুমি তোমার আত্মাকে সর্ব্ব-প্রকার কলুষ হইতে মুক্ত রাখিবে। যাহারা অবিশ্বাসী, পার্থিব জীবনে তাহাদিগের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তোমার হৃদয়ের মহত্ব প্রদর্শন করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না। কিন্তু অপবিত্রতা ও অনৃতবাদিত্বের জন্য কোন লোকের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে কিংবা অসৎপ্রকৃতির লোকের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব পোষণ করিলে তোমাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। কোন অবস্থাতেই মনের পবিত্রতা নষ্ট করিবে না।

আল্লাহ্ তোমার অন্তরে বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং তৎপ্রতি তোমার আকর্ষণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। অবিশ্বাস, অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা লঙ্ঘন এই তিনটি অপকৃষ্ট গুণের বিরুদ্ধে তোমার অন্তরে যেন বিতৃষ্ণা ভাব বদ্ধমূল থাকে। ৪৯ঃ৭

ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্মানুরক্ত মানব অনৃতবাদী ও অধার্ম্মিকগণকে ঘৃণা করিলেও নিরয়গামী হইবে না। কিন্তু এই শ্লোক

দ্বারা এছলাম এরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে যে, তুমি কোন মানুষকে ঘৃণা করিবে না। ঘৃণা করিবে তাহার অপকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে। পবিত্র কোরআনে সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে মানবকে সত্য পথে চালিত করাই এছলামের মূল নীতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সত্যের দুন্দুভি নিনাদ ঘোষিত করাই মুছলমানের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে সমাহিত চিত্ত মুছলমান অসত্য পথ কণ্টকাবৃত করিয়া প্রত্যেক মানবকে সত্যপথে আকৃষ্ট করিতে সর্ব্ব-প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে। তাহার প্রশস্ত হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, হিংসার শাণিত কৃপাণ তাহার মস্তকের উপর দোদুল্যমান রহিয়াছে, সে তাহার হৃদয়ের প্রভু মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। মুছলমান যদি সত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইত, হীন স্বার্থ চালিত হইয়া যদি অধর্ম্ম আশ্রয় করিত, তাহা হইলে এছলামের মহত্ত্ব, এছলামের সৌন্দর্য্য পৃথিবীর বক্ষে কখনই ফুটিয়া উঠিত না; তাহা হইলে এছলামের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় মানব তাহার প্রাণের সন্তাপ দূর করিতে কখনই ছুটিয়া আসিত না। সত্যের একনিষ্ঠ সাধক মহাপ্রাণ মোহাম্মদ সর্ব্বদাই বলিতেন, "যখন কথা বলিবে, সত্য বলিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশ্য তাহা পালন করিবে, গচ্ছিত দ্রব্য চাহিবা মাত্র ফিরাইয়া দিবে। তোমাদের বাক্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে অসত্য পরিহার করিবে। সকলের সহিত প্রিয়-ব্যবহার করিবে, এবং হালাল হারাম (বিধি নিষেধ) মান্য করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

এছলাম মানবের নৈতিক জীবনে যে সমস্ত গুণাবলি প্রস্ফুটিত করিয়াছে, তাহারই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে জগতের মানব আকৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, মানব যখন

সত্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া পশুভাবাপন্ন হইয়াছিল, তখনই সেই মহান্ আল্লাহ্ এছলাম প্রচারার্থ হজরত মোহাম্মদকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য পবিত্র কোর-আনে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

"এই ধর্ম্মোপদেশক মানবের কল্যাণার্থ আত্ম-নিয়োগ করিবেন, কখন তাহাদের অমঙ্গল কামনা করিবেন না। তিনি যাহা পবিত্র এবং আবশ্যকীয় তাহারই সম্ভোগার্থ সুনীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন এবং যাহা অপবিত্র এবং অব্যবহার্য্য তাহার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিবেন। সমাজের শাস্তির ভয়ে তাহারা যে অসত্যের এবং অমঙ্গলের গুরুভার মস্তকে বহন করিতেছে, তিনিই তাহাদের সেই ভাব অপনোদন করিবেন। যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহার সহিত যে আলোক প্রেরিত হইয়াছে, সেই আলোক অনুসরণ করিবে, এই পৃথিবীতে তাহারাই উন্নতি করিতে পারিবে।"

এই শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্ম যাহা ধরণীর বক্ষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্ধার করিতে মহানবী মোহাম্মদের আবির্ভাব, এবং জগতের কল্যাণার্থ তিনি ইহা পুনরায় প্রচারিত করিয়াছেন। মানবের বিবেকের দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে সুপথে চালিত করাই এছলামের মহৎ উদ্দেশ্য। নৈতিক জীবনে এছলাম যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানব যদি তাহার সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সে পৃথিবীর লোকের প্রশংসার পাত্র হইয়া তাহার পর জীবনে মহান্ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যসুখ ভোগ করিতে পারে।

এছলাম প্রত্যেক মানবকে তাহার আত্মার ইহলৌকিক ও পারত্রিক

মঙ্গলসাধন করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহিত করিয়াছে। পবিত্র কোর-আনে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা নিজের আত্মার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তোমার পারত্রিক মঙ্গলের নিদানভূত সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিবে। অপর লোকের মুক্তির জন্য তুমি সত্যপথভ্রষ্ট হইয়া তোমার আত্মার অমঙ্গল বিধান এবং অন্তরের সরলতা ত্যাগ করিবে না। তুমি যদি সত্যপথে চালিত হইয়া কর্ত্তব্যে সমাহিত হও এবং তজ্জনিত যদি অপর কোন লোক অসত্যপথ অবলম্বন করে, তুমি কদাচ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র বিরাগ-ভাজন হইবে না। তোমার আত্মাকে ধ্বংস করিয়া অপর লোককে রক্ষা করা তোমার উচিত নয়।" ৫ঃ ১০৪

পবিত্র আত্মা পুরুষ-প্রধান হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছেন, "তোমার নিজের উপরও তোমার দাবী আছে।" ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে পরের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করিবে না। নিজের মঙ্গলের জন্য যিনি উদাসীন, তাঁহার দ্বারায় কখনও পরের মঙ্গল হইতে পারে না। নিজের চিত্ত শুদ্ধি না করিয়া কেহ পরের চিত্তের মলিনতা দূর করিতে পারে না।

এছলাম নির্দ্দেশ করিতেছে মনে মনে কুচিন্তা করাও পাপ; কারণ তোমার মনের কথা তাঁহার ত অগোচর থাকে না। পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চয়ই তোমার প্রভু সম্যক্ প্রকারে অবগত আছেন কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ না করিয়া কুপথে পদবিক্ষেপ করে এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন কোন্ ব্যক্তি সত্যানুবর্ত্তী হইয়া সত্যপথে বিচরণ করে।" ৬ঃ ১১৮। "প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সমস্ত মন্দ সংস্রব ত্যাগ করিবে। কারণ তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই।" ৬ঃ ১৫২

"যদি কোন ব্যক্তির মনে স্বভাবতঃ কুচিন্তার উদয় হয়, কিন্তু তিনি যদি তাহা দমন করিতে পারেন, কি মন হইতে দূর করিতে পারেন এবং তদনুরূপ কার্য্য না করেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁহাকে সুফল প্রদান করিবেন।" বোখারী।

প্রবৃত্তি চালিত হইয়া মানুষের মনে কুচিন্তার উদয় হইয়া থাকে। এ সংসারে প্রলোভন সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, সম্ভ্রম প্রতিপত্তির প্রলোভন, রূপবতী নারীর প্রলোভন, ইত্যাদি কত প্রকার প্রলোভন। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া যিনি সংযমী হইতে পারিবেন, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করিতে পারিবেন। কারণ তাহার মনের অবস্থা সেই সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভুর অজ্ঞাত নহে। এ সম্বন্ধে মহাধর্ম্ম পুস্তকে কথিত হইয়াছে, "এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, আল্লাহ্ই তাহার অধীশ্বর। তিনি সৎকর্ম্মশীল মানবকে উত্তম ফল প্রদান করেন এবং অসৎকর্ম্মশীল মানবকেও তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি অকস্মাৎ উদ্গত প্রবৃত্তি চালিত পাপ ও অশ্লীলতার পথ হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারেন, তাহার প্রভু তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে কখনও কৃপণতা করেন না।" ৫৩ : ৩১, ৩২

প্রবৃত্তি মনকে কুপথে চালিত করিতেছে, সেই সময় বিবেকের দ্বার মুক্ত হইয়া তাহার অন্তরমধ্যে যদি এছলামের জ্ঞান ও শিক্ষা পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে সহস্র শয়তানও তাহাকে কুপথগামী করিতে পারিবে না। এছলামের শিক্ষা আর সেই শিক্ষার পরিণতি মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধি যদি একবার তাহার অন্তর আলোকিত করে, তাহা হইলে ক্ষণিকের জন্য ভ্রান্তির অন্ধকার সে আলোক-শিখায় নিশ্চয় দূরীভূত হইবে।

এছলামের শিক্ষার দ্বারা মানবের দুষ্প্রবৃত্তির দ্বার কি প্রকারে রুদ্ধ হইয়াছে, এছলাম ধর্ম্ম-পুস্তকে তাহা অতি সুন্দর ও বিশদভাবে বর্ণিত

হইয়াছে। দুষ্প্রবৃত্তির সহস্র দ্বার, এই দ্বার পথে মানব-হৃদয়ে পাপের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানব পবিত্র অন্তর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই পবিত্রতা রক্ষা করা তাহার সমস্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা; প্রত্যেক মানবই সৎস্বভাবাপন্ন হইতে ভালবাসে, ব্যভিচার ও চরিত্রহীনতা সকলেরই ঘৃণ্য। মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাকে সৎকর্ম্মে উত্তেজিত করে এবং অসৎকর্ম্মকে দূরে পরিহার করে। সৎ ও অসৎপথ বিবেক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি তাহাকে সৎপথেই চালিত করিয়া থাকে। যখন পাপের প্রলোভন তাহার চক্ষের সম্মুখে নিপতিত হয়, তখন তাহার সেই পবিত্র মন সংশয়ারূঢ় হইয়া তাহাকে উভয় পথেই (পাপ ও পুণ্য) আকৃষ্ট করে। ভ্রান্তি যদি তাহার মনকে সে সময় অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য; কিন্তু এই ভ্রান্তি যাহাতে অধিকার স্থাপন করিতে না পারে, সেইজন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের আবশ্যক। মানব-চরিত্র গঠিত করিতে ও তাহাকে জ্ঞানমার্গে চালিত করিতে পবিত্র কোরআনে যে অনুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার তুলনা জগতে অন্য কোন ধর্ম্ম-পুস্তকে নাই, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

এছলামে নারীর অধিকার

বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্ নর ও নারীকে একই উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন। নারী পুরুষের তাপদগ্ধ জীবনে স্নিগ্ধ প্রবাহিনীর মত শান্তিদায়িনী, প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-দগ্ধ মরু-ভূ-বক্ষে তুষার কণ-বাহিনী নির্ম্মল নির্ঝরিণী।

এছলামের অনুশাসনে নারীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পবিত্র কোর-আনে উক্ত হইয়াছে, ("নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের উপরও নারীর ঠিক তেমনি অধিকার আছে।") ২ঃ২২৮। "পুরুষ নিজে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতে তাহার নিজের অধিকার, আর নারী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতেও তাহার নিজের অধিকার।" ৪ঃ৩২

নারী পুরুষের চিরকল্যাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী। এছলাম মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতেছে মহীয়সী মহিলা কোন প্রকারে পুরুষের অবজ্ঞার পাত্রী নহে। মানবের সর্ব্বদা তৃপ্তিদায়িনী, সুখ-দুঃখের অংশ-ভাগিনী জীবন-সঙ্গিনী, অন্ধকারময় জীবন যাত্রার পদবীতে পথপ্রদর্শিকা প্রদীপ্ত আলোকশিখা।

(বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ দানের নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই ন্যায় একই উপাদানে কোমলতাময়ী নারী সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহার সঙ্গলাভে সুখী হইতে পার এবং আল্লাহ্ করুণাময় তাই তিনি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারিত করিয়াছেন। ৩০ঃ২১)

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের পথ উভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত। একের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া অন্যের চক্ষে তাহাকে খর্ব্ব করিবার জন্য এছলাম কখনও উৎসাহ দান করে নাই।

পবিত্র কোরআনে প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা বিবাহিত পুরুষ আদিষ্ট হইয়াছে যে, বিবাহকালীন অঙ্গীকার অনুরূপ অর্থ (দেনমোহর) দিবার জন্য স্বামীকে সমস্ত জীবন প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ স্ত্রী যে মুহূর্ত্তে সেই অর্থ দাবী করিবেন, সেই মুহূর্ত্তে স্বামীকে তাহা নিশ্চয়ই পরিশোধ করিতে হইবে।

নারীর জন্য নরের প্রতি নরোত্তম নবীর উপদেশ বাণী।—

নারীর অধিকার অতি পবিত্র, ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিও না।

নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী।

পুরুষের চক্ষে নারী সকল সময়ে সম্মানের পাত্রী, যেহেতু নারী জননী, ভগিনী এবং অর্দ্ধাঙ্গিনী। নারী পুরুষের জীবনে বিপদে বন্ধু, সম্পদে সুখ, সঙ্কটে মন্ত্রী, গৃহে সাম্রাজ্ঞী। ভালবাসার চক্ষে ভালবাসার আধার অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী সহধর্ম্মিনীর নিষ্কলঙ্ক মুখ-চন্দ্র—স্বামীর বিপদে বন্ধু, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সুখ। কোমলতাময়ী সৃষ্টিকর্ত্তার অতুলনীয়া সৃষ্ট নারী, তাহার প্রতি যে পাষণ্ড অত্যাচার করে, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট কদাচারী আর তাহাকে যে কুপথগামিনী করে, অনন্ত নরকে তাহার বাস।

(উপাসনাগারে (মছজেদে) নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। মহানবী তাঁহার জীবদ্দশায় নারীকে সেই মহান আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন।)

পুরুষের জীবনে অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান সামগ্রী। নারী কখনও ঘৃণার পাত্রী নহে। তাহার গুণ দোষের বিচার করিয়া, তাহার গুণের সমধিক আদর করিবে এবং

তাহাতেই আনন্দিত থাকিবে; এবং আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিবে, তিনি তোমাকে এমন গুণবতী নারীরত্ন দিয়াছেন।

মহান্ আল্লাহ্‌র নিকট এবং জগতের নিকট সেই নির্দ্দোষ, যে তাহার স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদা নির্দ্দোষ।

মুছলমানের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্ তাহার চরিত্র, এবং সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র যে ব্যক্তি চরিত্রবান্ এবং তাহার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

হজরত মাবিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে রছুলুল্লাহ, আমার প্রতি আমার স্ত্রীর কি অধিকার আছে?" উত্তরে মহানবী বলিয়াছিলেন, "তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার যে অধিকার।"

সন্তানের স্বর্গ তাহার জননীর চরণতল।

স্বামী-স্ত্রী একাসনে আহার করিলে তাহাদিগের পরস্পর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতেই সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষ উৎপাদন করে।

ধৈর্য্য-সহকারে স্ত্রীর কর্কশ স্বভাব সহ্য করিবে তাহাতে মহান্ ধৈর্য্যশীল আইয়ুব নবীর (Job) সমান পুণ্য সে অর্জ্জন করিতে পারিবে।

যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-সংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন জীবন যাপন করে, সে যতদিন গৃহে প্রত্যাগমন না করিবে, তাহার সমস্ত উপাসনা বিফল হইবে।

ইবনে মোবারক যখন ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন হজরত মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কোন্ কাজ অধিকতর প্রশংসনীয়? উত্তরে নবী বলিয়াছিলেন যে স্ত্রী-পুত্র এবং অবশ্য প্রতিপাল্যদিগকে যথোচিত ভরণপোষণ করিয়া শান্তি দান করিয়া থাকে, তাহার কার্য্যই প্রশংসনীয়।

নারী জাতির জন্য মহানবীর অন্তিম উপদেশ ঃ—(হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, তোমাদিগের যেমন স্বাধীন অধিকার আছে, তোমাদিগের সহধর্ম্মিণীদিগেরও সেইরূপ স্বাধীন অধিকার আছে। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র করুণায় তোমরা তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছ, এজন্য তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ পালন করিবে, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।)

এছলামে বিবাহ-বিধি ঃ—পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে এছলাম যে বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, উদারতায় এবং নৈতিক উৎকর্ষে তাহা জগতে অতুলনীয়। কতিপয় বিশিষ্ট নিকট আত্মীয় ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন একেশ্বরবাদীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ধর্ম্মানুমোদিত। বিবাহ ব্যাপারে আভিজাত্যের গৌরব রক্ষা করা এছলামের নীতিবিগর্হিত। আভিজাত্যাভিমানিনী কোরেশ-নন্দিনী বিবি জয়নবের সহিত মুক্ত ক্রীতদাস জয়েদের বিবাহ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এইরূপ বহু ক্রীতদাস উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া সম্রাট্‌নন্দিনীদিগের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মানবের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ রহিত করিয়া এছলাম সাম্যবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। দারপরিগ্রহে নারীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহার সম্মতিগ্রহণ একান্ত আবশ্যক। ইহাতে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান এবং পুরুষের চক্ষে নারী চিরদিনই সম্মানের পাত্রী।

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চায় নারীর অধিকার খর্ব্ব করিবার কোন উপায় নাই। এছলামের উন্নতযুগে মোছলেম মহিলাগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতির চরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষের নিকট শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আবশ্যকবোধে পুনরায় পুরুষকে তাহা শিক্ষা দিতেন। হজরতের ধর্ম্মপত্নী মোছলেম কুলজননী বিবি আয়েশা ছিদ্দিকা,

মহানবীর কন্যা বিবি ফাতেমা, হজরত আলীর পৌত্রী বিবি ছখিনা, বিপুলকীর্ত্তি খলিফা হারুণঅররশিদের ধর্ম্মপত্নী বিবি জোবায়দা প্রভৃতি মোছলেম কুলরমণীগণ দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে ও সাহিত্যে যশের ভাতি প্রদীপ্ত করিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া। খলিফা মোকতাদর বিল্লাহর মাতা বোগদাদ্ হাইকোর্টের চিফ্ জাষ্টিসের (প্রধান বিচারপতির) কার্য্য করিতেন, আইন বিভাগে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও বিচারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়া তিনি শত্রু-মিত্র সকলেরই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মিশরের রাজধানী কায়রো নগরীর অধিবাসিনী বিবি তাকিয়া খাতুন পবিত্র কোরআনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে শেখা শোহ্দা বিনি ফখরোন্নেছা অর্থাৎ নারী জাতির গৌরব নামক পদবী লাভ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত কুল মহিলা বোগদাদের জামে মছজেদে কবিতা, অলঙ্কারশাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তাঁহার মর্য্যাদা ও স্থান এছলাম জগতে শ্রেষ্ঠ আলেমের (পণ্ডিতের) পার্শ্বে সমভাবে প্রদান করা হইয়াছিল। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিতা বিবি জয়নব ওম্মেয়াল্-মোয়াইদ গবর্ণমেন্টের আইন কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। বিবি জয়নাব-অল্-মরবিয়া ও বিবি মরিয়ম খাতুন কর্ডোভার নারীশিক্ষা সদনের ব্যাকরণ; দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। স্পেনের অধিবাসিনী বিবি উম্মোতোল্ আজীজস্ শরীফা ও আল্গাছানিয়া ইহারা দুই ভগিনী দর্শন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ন্যূনকল্পে ৭০ খানি মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কর্ডোভা নগরে কেবলমাত্র খলিফা আবদার্ রহমান আজমের সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণা উপাধিধারিণী রমণীর সংখ্যা ৫৩৭০ জন ছিল।

এছলাম জগতে নারীর স্বাধীনতা সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল, সংসারক্ষেত্রে নারীর নারীত্বের দাবী উপেক্ষিত হয় নাই। নৈতিক জীবনে যাহাতে তাঁহারা আদর্শ-নারী বলিয়া জগতের লোকের নিকট প্রশংসার পাত্রী হইতে পারেন, এছলাম কেবলমাত্র সেই সমস্ত বিধি নারীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। নারী-চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষার্থ এছলামের এই সমস্ত বিধি অনেকে কঠোর বলিয়া মনে করিতে পারেন, এবং এই সমস্ত বিধি-প্রবর্ত্তন নারীর আত্মমর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়া কোন কোন হৃদয়বান্ লোক আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু এছলাম কেবলমাত্র নারীকে গৃহ-প্রাচীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া বহির্জগতে তাহার প্রতিভা বিকসিত হইবার কোন পথই রুদ্ধ করে নাই। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বহির্জগতে, নারীর কর্ম্মক্ষেত্র অন্তঃপুরে, সেইজন্য নারীকে সংসার রঙ্গমঞ্চে সম্রাজ্ঞী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে এছলাম আদেশ করিয়াছে, পুরুষকে অবনত মস্তকে রাজপথে ভ্রমণ করিতে হইবে। এ বিধিও পুরুষের পক্ষে কঠোরতায় নিতান্ত কম নহে। চরিত্র—পুরুষ কি স্ত্রী, উভয়েরই নৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এই চরিত্র রক্ষার্থ এছলামের নীতি অনুধাবনযোগ্য। চরিত্রহীন কি পুরুষ কি নারী, সকলের চক্ষেই ঘৃণ্য। ব্যভিচারের মত মহাপাপ আর নাই, পুরুষ কি স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই সমান পাপ। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ব্যভিচারকে মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কিন্তু এই ব্যভিচারের স্রোত প্রতিহত করিতে এছলামের অনুশাসন অতুলনীয় এবং প্রত্যেক পুরুষ কি স্ত্রীর অবশ্য প্রতিপাল্য। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "বিশ্বাসী স্ত্রী ও পুরুষদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের সম্ভ্রম ও শীলতা রক্ষা করিয়া অবনত

বদনে (গমনাগমন করে); নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন অন্তরঙ্গ নিকট আত্মীয় ব্যতীত রমণীগণ যেন তাহাদের বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি অপর কাহাকেও প্রদর্শন না করে এবং (তাহাদের হস্তপদ ও মুখ যাহা অপ্রকাশ রাখিবার উপায় নাই) অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ বাহির হইয়া থাকে, তাহা ব্যতীত তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ যেন বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখে। ইহাই পবিত্রতার মূলাধার। কারণ তাহারা যাহা করে, মহান্ আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহা জানিতে পারেন।" ২৪ ঃ ৩০, ২১ *)

স্বনামধন্য, বিজ্ঞপ্রবর, সর্ব্ব শাস্ত্র-বিদ্ মওলানা মোহাম্মদ আলি এম-এ, এল্ এল-বি মহোদয় তাঁহার অনূদিত পবিত্র কোরআনের ভূমিকায় নারী-প্রসঙ্গে উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা সেই ইংরাজি ভাষার বঙ্গানুবাদ করিয়া সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি —

"স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিকেই দৃষ্টি নত করিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা আবশ্যক বোধে বাটীর বাহিরে যাইতে পারেন, তাহাতে নিষেধ নাই। স্ত্রীলোকদিগের যদি বাহিরে যাইবার আদেশ না থাকিত, তাহা হইলে পুরুষদিগকে দৃষ্টি নত করিতে বলা হইল কেন? প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কোরআনের আদেশানুযায়ী স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি নত করিতে বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা বাহিরে চলাফেরা করিবার সময় একে অন্যের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। যে সমাজে স্ত্রীলোকগণ সাধারণ্যে বাহির হয় না, সে সমাজের পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টি নত করিতে বলার কোন অর্থ নাই এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রতিও দৃষ্টি নত করিতে বলা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা তাহারা ত আর অন্তঃপুর ত্যাগ করিতে পারিবে না।

নর নারীর পরস্পর সম্বন্ধ সংরক্ষণ ও পরস্পরের অবাধ মিলন রোধ করিবার জন্য পবিত্র কোরআন উভয় জাতিকে দৃষ্টি নত করিয়া চলাফেরা করিবার আদেশ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উভয় জাতির প্রতি সমান আদেশ; কিন্তু নারী জাতির প্রতি আর একটি অতিরিক্ত আদেশ হইতেছে "যাহা স্বভাবতঃ বাহির হইয়া থাকে, তাহা ব্যতীত আর সব গোপন রাখিবে", ইহার অর্থ হস্ত ও মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিবে। কেননা হাত ও মুখ ঢাকিয়া সংসারের কোন কাজ সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না। অতএব মুখ ও হাত ব্যতীত শরীরের অপরাংশ বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখা আবশ্যক।

("হে রছুল, তোমার স্ত্রী, কন্যা ও বিশ্বাসিদিগের স্ত্রীলোকগণকে বল, তাহারা তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপর যেন কোন দীর্ঘ আবরণ রক্ষিত করে, তাহা হইলে তাহারা আত্মসম্মানশীলা সাধ্বী বলিয়া, পরিজ্ঞাতা হইবে।" ৩৩ : ৫৯)

That women went to mosques with their faces uncovered is recognised on all hands, and there is also a saying of the Holy Prophet that when a woman reaches the age of puberty, she should cover her body except the face and the hands. The majority of the commentators are also of opinion that the exception relates to the face and the hands.

অর্থাৎ মোছলেম মহিলাগণ মুখ অনাবৃত অবস্থায় মছজেদে যে যাইতেন 'ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত, এবং হজরতের একটি হাদিছেও বর্ণিত আছে, 'স্ত্রীলোকেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত শরীরের অন্যান্যাংশ ঢাকিয়া রাখিবে।' অধিকাংশ টীকাকারগণ হাত ও মুখ অনাবৃত রাখা সম্বন্ধে একই মত।"

হজরত আলী ও হজরত এবনে আব্বাছ (র':) হইতে বর্ণিত আছে উপরোক্ত আয়াত "যাহা স্বভাবতঃ বাহির হইয়া থাকে তাহা ব্যতীত" ইহার অর্থ মুখমণ্ডল ও হাতের পাঞ্জার (প্রকোষ্ঠের) অলঙ্কারই নির্দ্দেশ করে; কেননা স্ত্রীলোকগণের পুরুষের সহিত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আদান প্রদানের জন্য মুখমণ্ডল ও হাতের পাঞ্জা অনাবৃত রাখা আবশ্যক। হেদায়া।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে—"হে রছুলের স্ত্রীগণ, তোমরা অন্য কোন স্ত্রীলোকের মত নহ; যদি তোমরা সতর্কভাবে চল, তাহা হইলে (অন্য পুরুষের সঙ্গে) কথা-বার্ত্তায় এরূপ ভাব প্রকাশ করিও না, যাহাতে যাহার অন্তঃকরণে যে ব্যাধি আছে, তাহা প্রকাশ করে এবং ভাল কথা বল।" ছুরা আহজাব ৩২ আয়েত।

ইহা হজরতের স্ত্রীগণের সম্বন্ধে বর্ণিত হইলেও সমগ্র মোছলেম নারীদিগের পক্ষেও মহান্ আদর্শ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ। উক্ত আয়াতে নারীকে অপর পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে নিষেধ করা হয় নাই; কেবল যাহাতে কাহারও মনে কোন কুভাব উদয় না হয়, সেইজন্য গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে আদেশ করা হইয়াছে।

নারীর মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে নারীর আসন কত উর্দ্ধে স্থাপিত, পবিত্র কোরআনে অনেকস্থলে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে স্ত্রী ও পুরুষের অধিকারের কোন প্রভেদ নাই। "স্ত্রীলোক যেমন তোমার অঙ্গের আভরণ, তুমিও তেমনি, তাহার অঙ্গের আভরণ।" ২ ঃ ১৮৭ উত্তম শ্লোক মহানবীর (দঃ) আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে নারীর ব্যক্তিগত কোন অধিকার ছিল না, তাহাদিগকে সংসারের তৈজসপত্রের সমান করিয়া রাখা হইত। কিন্তু এছলাম আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করিল, তাহার প্রতি তোমার যে অধিকার, তোমার প্রতিও তাহার সেই অধিকার। কোমলতার আধার নারী মানবের তৃষিত প্রাণে প্রীতি ও স্নেহের পবিত্র নির্ঝরিণী। তাহার প্রেম সেই নির্ঝরিণীর শীকর-সলিল। পবিত্র আত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, "স্মরণ রাখিও, আমি তোমাদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তোমরা নারীজাতিকে সর্ব্বদা করুণা প্রদর্শন করিবে। কোন লোক যেন তাহাদিগকে ঘৃণা প্রদর্শন না করে।"

মোছলেম বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শব্দশাস্ত্র ও ভাষাবিদ্ ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্ ছাহেব নিখিল বঙ্গীয় মুছলিম যুবক সম্মিলনের সভাপতিরূপে স্ত্রী-শিক্ষা ও পর্দ্দা সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে যে মূল্যবান্ কথা কয়টি বলিয়াছিলেন তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন :—"শিক্ষাবিস্তারের কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে না। তারা সমাজের অর্দ্ধেক। তারা আমাদের আধা শরীর। এই আধাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে কখনই আমরা ভাল থাক্‌তে পারিনে।......এছলামে নারীকে তা'র উপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে, এ দাবী জগতের কাছে কর্‌লে তারা ঠাট্টা কর্‌বে। কারণ জগৎ দেখবে না, এছলামের কেতাব, দেখবে শুধু মোছলেমের ব্যাভার। যদি নারীর শিক্ষা ও অধিকারের কথা উঠল, তবে পর্দ্দার কথা এখানে তোলা অন্যায় নয়। পর্দ্দা দুরকম—একরকম এছলামী পর্দ্দা, সে হচ্ছে মুখ, হাত, পা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা

আধ্যাত্মিক জীবনে নারীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সেই মহান্ আল্লাহ্‌র বাণী পবিত্র কোরআনে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, "যে কেহ সৎকর্ম্ম করিবে, স্ত্রী কিংবা পুরুষ এবং তাহারা যদি বিশ্বাসী হয়, তাহারাই সেই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহাদিগের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।" ৪ ঃ ১২৪

আর এক অন্-এছলামী পর্দ্দা, সে মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে চিরজীবনের জন্য কয়েদ ক'রে রাখা। এছলামী পর্দ্দায় বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরুন, কি অন্যের সঙ্গে দরকারী কথাবার্ত্তা মানা নয়; অন্-এছলামী পর্দ্দায় এ সব হবার জোটি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, এই অন্-এছলামী পর্দ্দা ফাঁক ক'রে দিতে। তা'না হ'লে আমাদের নারী হত্যার মহাপাপ হবে। গেল লড়াইয়ের আগে ইউরোপে এই এছলামী পর্দ্দাই ছিল। এখন ইউরোপ আধা নেংটা। তার ফলে ইউরোপে যা দাঁড়িয়েছে, তা একবার সেখান থেকে ঘুরে এলেই মনে গাঁথা হ'য়ে যাবে। স্বাধীনতার নামে কোন বিবেকী মানুষ কখনই উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। আমাদের সাবধান হওয়া চাই, যেন খারাপকে ধ্বংস করতে গিয়ে আমরা ভালকেও না ধ্বংস ক'রে ফেলি।" (নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলন দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৮ সাল ইংরাজী, কলিকাতা।)

মোছলেম সাহিত্য-গগনের উদীয়মান ভাস্কর মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব এই সম্বন্ধে বলেন:—"আমাদের মতে এই পর্দ্দার (বর্ত্তমান অবরোধ প্রথার) অনুকূলে কোনও দলিল নাই—বরং পবিত্র কোরআন, হাদিছ, খাইরুল-কুরুণ বা স্বর্ণযুগের ইতিহাস, সমগ্র মোছলেম জগতের অতীত ও বর্ত্তমান আচার, একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

Dr. Sir P. C. Ray says :—"To-day, however, we find the Purdah and Veil as symbols of respectability among even the educated Muslims with the result as the Health officer of Calcutta says in his latest report that Tuberculosis is levying a frightful toll." (Europe's Debt to Islam by Syed M. H. Zaidi. Forward iii.)

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুছলমান সম্প্রদায়ের ভিতর অবরোধ প্রথা সম্মানের চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিণাম ফল যেমন কলিকাতার স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ (Health officer) সম্প্রতি যে রিপোর্ট দিয়াছেন "যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুর হার ভয়াবহরূপে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।"

"যে কেহ সৎকর্ম্ম করিবে, পুরুষ কি স্ত্রী, এবং তাহারা যদি বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা তাহার জীবন সুখে অতিবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিব। তাহারা যে সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহার জন্য আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিব।" ১৬ ঃ ৯৭

"যে কেহ সৎকর্ম্ম করে, পুরুষ কি স্ত্রী, তাহারা যদি বিশ্বাসী হয়, তাহারাই সেই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং সেই স্থানে তাহারা পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর পদার্থ পাইবে।" ৪০ ঃ ৪০

এই প্রকার বহু শ্লোকে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সমান অধিকার পবিত্র কোরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নারী পুরুষের কেবলমাত্র ভোগবিলাসের উপকরণ, কি তাহার ক্রীড়াসঙ্গিনী নহে, তাহার পরিচারিকা নহে, তাহার সহধর্ম্মিণী, স্বর্গোদ্যানে প্রবেশাধিকার নারী ও পুরুষের পক্ষে কোন বিভিন্নতা নাই। বিঘ্ন-সঙ্কুল সংসার-পথে অনুগতা প্রিয়বাদিনী সহধর্ম্মিণী সে পথের সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিয়া স্বামীর প্রাণে নিত্য শান্তি প্রদায়িত্রী।

শৌর্য্যবীর্য্যে, সাহসিকতায় ও বুদ্ধিমত্তায় মোছলেম রমণীগণ জগতের বক্ষে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা কখনও মলিন হইবে না। রাজনীতিক্ষেত্রে ও রাজত্ব পরিচালনায় তাঁহারা প্রখর বুদ্ধিশালিনী ছিলেন, অনেক মুছলমান সম্রাট ও খলিফা-গণ তাহাদেরই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেন। সম্রাজ্ঞী রিজিয়াকে ও নূরজাহানকে আমরা রাজ্য পরিচালনা করিতে এবং চাঁদ সুলতানাকে রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতে দেখিয়াছি। সংসারক্ষেত্রে যেমন তাঁহারা প্রীতিদায়িনী, রণক্ষেত্রে তেমনি প্রচণ্ড বলশালিনী রণরঙ্গিণী; অশ্বারোহণে সুদক্ষা মোছলেম রমণী পুরুষের পার্শ্বে সংহার মূর্ত্তিতে শত্রু সংহার করিয়া, দেশের কল্যাণদায়িনীরূপে আবালবৃদ্ধবনিতার

শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী হইয়াছেন। আরব রমণীগণের রণপ্রতাপ ও বীরত্ব গাথায় এক সময় জগত স্তম্ভিত হইয়াছিল। ওহোদের রণ-ক্ষেত্রে বীর রমণী ওম্মেআম্মারার অসাধারণ বীরত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণতা ঐ যুদ্ধের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত জোবেরের (রাঃ) প্রিয়তমা পত্নী অমিততেজসম্পন্না বিবি আছমা বেন্তে আবুবকর এরমুখ যুদ্ধে আপনার স্বামীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া পুরুষোচিত বিক্রমে অসি-চালনা করিয়া যে ভাবে শত্রু সংহার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে। সুবিখ্যাত উষ্ট্রযুদ্ধে বিবি আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) স্বয়ং সেনাপতিরূপে সৈন্যচালনা করিয়া এবং স্বরচিত কবিত্ব গাথায় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে কখনও লুপ্ত হইবে না। পারস্য দেশবাসিনী বীরাঙ্গনা এজাজবানু দস্যুদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া দস্যুদলপতিকে সংহার করিয়া যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মাত্রই তাহা অবগত আছেন। তাঁহার এই বিজয় গৌরবের সম্মান প্রদর্শনার্থ পারস্যাধিপতি তাঁহাকে এক মহামূল্য রত্নহার প্রীতি-উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। দামাস্কাসের রণক্ষেত্রে বীর রমণী আবান বনিতা যেরূপ অব্যর্থ সন্ধানে শরনিক্ষেপ করিয়া সম্রাট্ হেরাক্লিয়াসের জামাতা প্রধান সেনাপতি টমাসের চক্ষু বিদীর্ণ ও অসংখ্য রোমক সৈন্যকে সন্ত্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া যুদ্ধের বিজয়-গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি যে সাহস ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, সামরিক নীতিশাস্ত্রে তাহাও অতুলনীয়। বীররমণী জাত-উল্‌হেম্মা বহু বীরপুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বহু যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ বীরাঙ্গনা খাওলা, বিবি আফিরা, বিবি সফিয়া, ওম্মেছালীত, ওম্মেহলীম, বিবি খানছা, বিবি ছল্‌মা, খোলাবেন্তে

ছোলবাহ., কাউববেন্তে মালেক, ছাল্‌মাবেন্তে হাশেম, নামবেন্তে কানাছ, আমীর মাবিয়ার মাতা ও ভগিনী, জোফেলাবেন্তে আফারাহ্‌ প্রভৃতি অসংখ্য বীর রমণী পুরুষের পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া বহু রণ-ক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। খলিফা মনছুরের দুই ভগিনীও যদ্ধবিদ্যায় ও রণকৌশলে অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সাক্ষাৎ করুণরসরূপধারিণী শুশ্রূষাকারিণী রমণীগণ জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া আহতের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিত, তাহার মৃত্যুমলিন মুখশ্রী দীপ্ত করিয়া তাহার তৃষাতুর অধরোষ্ঠে জল প্রদান করিত, জননীর ন্যায় তাহার স্নেহের হস্ত সঞ্চারিত করিয়া তাহার মরণের পথ সুগম করিত। ভয়ে ভীতা হইয়া, কি স্বার্থে চালিতা হইয়া, মোছলেম রমণী কখনও নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় নাই, দেশের কি জাতির বিপদের সময় কখন তাহারা নিস্পন্দ জড় পুত্তলিকার মত অন্তঃপুরে অবস্থিতি করে নাই, ত্যাগের আদর্শে পুরুষের পশ্চাদবর্ত্তিনী বলিয়া কেহ তাহাদিগকে কলঙ্কিতা করিতে পারে নাই। হৃদয়ের উচ্চতায়, অন্তরের দৃঢ়তায়, মনের পবিত্রতায় মুছলমান রমণীগণ জগতে যে অক্ষয়কীর্ত্তি ও যশের ভাতি প্রদীপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক্‌ পরিচয় প্রদান করিলে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। (১)

স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্পর্কঃ—স্ত্রী জায়া, সখী, সহচরী, সঙ্গিনী, অনুবর্ত্তিনী, মানবজীবনে হ্লাদিনীশক্তি। তিনি শুদ্ধসত্বা, অপাপবিদ্ধা এবং আধারভূতা, বুদ্ধিতে তিনি ত্রিগুণাত্মিকা, এবং সংসারে কর্ম্মকর্ত্রী। যেমন সূত্র মণিময় হারের সকল মণিতেই

(১) Spriit of Islam, Woman by S. M. H. Kidwai and Simon Akali Rhindis' History of Arab Nation.

অনুস্যূত থাকে, সেই প্রকার সমস্ত সংসার তাঁহার শক্তিতে অনুস্যূত। এক আত্মা কিন্তু সংসারে সকল বিকারেই তিনি সাক্ষীরূপে বিরাজমানা। সংসারক্ষেত্রে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, সেই মহান্ আল্লাহ্‌তে বিশুদ্ধা রতি উৎপন্ন হয়, স্বাধ্বী এবং গুণশালিনী সহধর্ম্মিনী সেই সমস্ত কার্য্যের পথ প্রদর্শিকা। সজ্জন শুশ্রূষা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, সকল লব্ধ বস্তুর সৎপাত্রে অর্পণ, সাধুভক্তগণের সঙ্গ, পুরুষের এই সমস্ত গুণাবলীর উৎসাহদাত্রী তাঁহার স্ত্রী। অন্তঃপুরচারিণী হইলেও তিনি স্বামীর সহিত নিত্য সংযুক্তা, তিনি তাঁহার আত্মা, কৃপা, তেজ, বিভূতি, বল ও সত্যসঙ্কল্প এবং তাঁহা হইতেই যশ, আয়, বিত্ত, শান্তি সৌভাগ্য উদ্ভূত হইয়া থাকে। মনস্বিনী সহধর্ম্মিণী নিঃস্বার্থদর্শিনী হইয়া পরিজনবর্গের সেবা ও গুরুজনবর্গের শুশ্রূষা করিয়া, স্বামীর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন। এই প্রকার অনুগতা কর্ম্মকুশলা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে মাল্য, ভূষণ ও গন্ধ উপহার দিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন করা, পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য।

কন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্যঃ—পুত্রকে সুশিক্ষিত করা যেমন পিতার কর্ত্তব্য, কন্যাকেও শিক্ষিতা করা তাঁহার সেইরূপ কর্ত্তব্য! কিন্তু সামাজিক সঙ্কীর্ণতার মোহে পড়িয়া অধিকাংশ লোকই তাঁহার কন্যার প্রতি এই কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি করেন। অনেক লোক, এমন কি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সকলও, ভ্রমবশতঃ অবরোধ প্রথাকে এছলামিক পর্দ্দা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু গৃহপ্রাচীর মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া পর্দ্দার মর্য্যাদা রক্ষা করা এছলামিক অনুশাসনে কোথাও পরিদৃষ্ট হইবে না। আবার এই কঠোর অবরোধ প্রথা অনেকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া তাঁহাদের বালিকা তনয়াকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। জাতীয় জীবন গঠিত

করিতে এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে স্ত্রী-শিক্ষা কোন অংশে উপেক্ষণীয় নহে। যাহারা এক সময়ে গৃহকর্ত্রীর উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিতা হইবে, সংসারে কল্যাণদায়িনী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিয়া স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যে উৎসাহদাত্রী হইবে, জননীর স্থান অধিকার করিয়া সন্তানের ভবিষ্যত জীবন গঠিত করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ জননী করিতে হইলে তাহাদের পিতার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য তাহাদিগকে বাল্যজীবনে সুশিক্ষা দান করা। অতীতের বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছি মোছলেম ললনার শিক্ষার সৌন্দর্য্যে একদিন জগতের লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। আজ ভ্রান্তির মোহে পতিত হইয়া পিতা কর্ত্তব্যহীন, কন্যার শিক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন বলিতেন, সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভের দায়ী একমাত্র তাহার জননী। স্বাস্থ্যনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি শিক্ষার সহিত এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে এই অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী নারী-জীবনে কখন পরিস্ফুট হইতে পারে না। অতএব মানবজাতির মধ্যে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে হইলে এই মাতৃ-জাতীয়া বালিকাদের শিক্ষার জন্য তাহার পিতা কি অভিভাবকের তাহাদের বাল্যজীবনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। বিশ্বের কল্যাণের জন্য বিশ্বনবী বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক মুছলমানের—কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই বিদ্যাশিক্ষা করা ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সুদূর চীন দেশে গিয়া যদি বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও করিবে।"

এছলামে উপাসনা ও প্রার্থনা

মানবের আসক্তি ও পরিণতি

এই মহাধর্ম্মপুস্তক পবিত্র কোরআন যেন পবিত্র সলিল সম্পৃক্ত গিরি নিঝ'রিনী, শত সহস্র ধারায় পৃথিবীতে প্লাবিত হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত মলিনতা ধৌত করিয়াছে। এছলামের প্রতিপাদ্য বিষয়—সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। এই পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকের অবতারণা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই একত্ববাদ প্রচারিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র একত্ব এবং বিশ্ব-জনীনত্ব এছলামের মূল নীতি। সৃষ্টির প্রথম হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি মানবের কল্যাণার্থ তাহাদিগের ভিতর মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-ময়ের মহিমা কীর্ত্তন ও তাঁহার একত্ববাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কাল পরিবর্ত্তন-শীল, তাঁহাদের প্রচারিত সেই সত্য সনাতন ধর্ম্ম বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইল, মানব অসত্যের পথে আকৃষ্ট হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল, ধর্ম্মের নামে অত্যাচার, অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল। যাঁহার চিচ্ছক্তি অব্যর্থ বলিয়া যিনি সর্ব্বোত্তম, যিনি জীব জগতের নিয়ন্তা, যিনি পরিমাণ ও সীমার অতীত, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করিয়া মানব তাহার স্ববিকল্প চিত্ত দ্বারা আসুরিক পূজায় প্রবৃত্ত হইল, ভ্রান্তির মোহে নিপতিত হইয়া সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিল। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে:—জল ও স্থল সর্ব্বত্রই পাপের কালিমায় পরিব্যাপ্ত। ৩০ : ৪১

এমন সময় সর্ব্ব-মঙ্গলময় মহাপ্রভু মহান আল্লাহ নরশ্রেষ্ঠ মহানবী, পুণ্য-

শ্লোক হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) ধরণীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রেম-প্রবণচিত্ত মানবের দুঃখে গলিয়া গেল, কোমল অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, মানব-গণকে অসত্যের পথ হইতে সত্য পথে আকৃষ্ট করিতে, তিনি তাঁহার সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগ করিলেন, সর্ব্ব-প্রকার নির্য্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। আবার পৃথিবীর বক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃত মহিমা তাঁহার একত্ববাদ প্রচারিত হইল, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু, সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিতে তাঁহার অধিকার আছে, তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে কাহারও অধিকার নাই। মহামানব তখন নির্ভীক-চিত্তে মুক্ত-কণ্ঠে এই সত্য বাণী প্রচার করিলেন, প্রত্যেক ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষ এই সত্য-বাণী "মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ" প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তোমরা সেই মহান আল্লাহ্‌র পরিচর্য্যা করিবে, তিনি ভিন্ন তোমাদের আর কেহ উপাস্য নাই। ৭ঃ৫৯। হজরত নূহ, হুদ, মুছা, ঈছা (দঃ) প্রভৃতি প্রচাবকগণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত এবং তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রচার করিলেন—"হে মানবগণ, আল্লাহ্ তোমাদের একমাত্র প্রভু, একমাত্র উপাস্য, তোমরা তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও উপাসনা করিবে না। এ সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমাগত হইয়াছে। তিনিই তোমাদিগকে এই পৃথিবীতে মানবাকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাঁহারই অনুগ্রহে তোমরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেছ। অতএব তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ৭ঃ ৬৫, ৮৩, ৮৫। ১১ঃ ৪, ২৫, ৫০, ৬১, ৮৪।

এই কথা যখন সপ্রমাণিত হইল যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বহুঈশ্বরবাদিত্ব তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষ পরম্পরা দ্বারা ধর্ম্মের ভিতর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন মহাজ্ঞানী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস, এখন তোমরা আর আমরা ন্যায়ের সীমার মধ্যে অবস্থান করি, ন্যায়ের

আচ্ছাদনে আমাদিগকে আবৃত করিয়া স্বীকার করি যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও পরিচর্য্যা, আর কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার নামের সহিত আর কাহারও নাম সংযুক্ত করিব না এবং তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমাদের প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিব না।" ৩ঃ ৬৩

এক্ষণে মনে করিতে হইবে যে এই পবিত্র পুস্তকে যখন বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মহামানব ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন এই পবিত্র পুস্তকও সকল মানবের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। উপরি উক্ত শ্লোক অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতিপাদ্য বিষয় এই, ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন গতি একই মার্গে মিলিত করিয়া সকলেরই লক্ষ্যীভূত বিষয় সেই এক অদ্বিতীয় মহান্ আল্লাহ্‌র আদেশ ও উপদেশ সম্যক্ প্রকারে পালন করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অবশেষে তাঁহারই সান্নিধ্য-সুখ ভোগ করা অর্থাৎ তাঁহাতেই লীন হওয়া।

বিশ্বনিয়ন্তা মহান্ আল্লাহ্‌র এই একত্ববাদ ও তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব পবিত্র কোরআনে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক মানব মুগ্ধ হইবে এবং তাহার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে। এই স্বর্গীয় পুস্তকের প্রথমেই অতি অল্প কথায় তাঁহার একত্ব ও বিশ্বজনীনত্ব বর্ণিত হইয়াছে, ("বল, তিনি আল্লাহ্, তিনি এক, অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ হন তিনি, যাঁহার উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে, যিনি অজ, অক্ষর, নিত্য, যিনি কাহারও দ্বারা প্রজনিত নহেন কিম্বা কাহাকেও প্রজনন করেন নাই। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই।" ১১২ঃ ১-৪।) মহানবীর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে জগতে যে বহুঈশ্বরবাদিত্ব প্রচারিত ছিল, এই কয়টি বাক্যে তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে এবং এই কয়টি বাক্য সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এছলাম গুণের আদর করিয়াছে, সে বিষয়ে কখনও কৃপণতা করে নাই, কিন্তু গুণবান্ ব্যক্তির উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ

করিয়া তাঁহার পূজা করা এছলামের নীতি-বিগর্হিত। মানবে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করা যেমন চক্ষু আবৃত করিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন করা। এছলাম নির্ম্মল একেশ্বরবাদিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্য সর্ব্ব-প্রকার উপাসনা-প্রণালী রহিত করিয়াছে। এই একেশ্বরবাদিত্ব সপ্রমাণ করিতে এছলাম কেবলমাত্র কথার অবতারণা করে নাই কিংবা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে মানুষকে প্রলুব্ধ করে নাই। কর্ম্ম-জগতে যে পন্থানুসরণ করিলে কিংবা যে নীতি পালন করিলে মানব সাংসারিক জীবনে উৎকর্ষ সাধন করিয়া তদ্গত-চিত্তে সেই সর্ব্বমঙ্গলাধার মহান্ আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে পারে, পবিত্র কোরআনে তাহাই বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই সর্ব্ব-মঙ্গল নিদান মহান্ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সপ্রমাণ করিতে, এছলাম কেবলমাত্র নিজের মত প্রচার করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে নাই। মানবের ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস কেবলমাত্র কোরআনে বর্ণিত বিষয়ের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। "যাহারা বিশ্বাসী তাহারা সৎকর্ম্মে নিরত থাকে"—এই মহা সত্য-বাণী পবিত্র-ধর্ম্ম-পুস্তকে পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। এই সত্য-বাণীর বহুল আবর্ত্তন মুছলমানদিগের বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তাহাদিগের কর্ম্মশক্তি প্রকটিত করিবার সমস্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে। বিশ্বাস ও কর্ম্ম এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে একের অভাবে অন্যটি কখনই সেই মহান্ আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এই কারণে বিশ্বাসিগণকে পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে. "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে।" ৪ : ১৩৬ "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কর্ত্তব্য

পালন করিতে যত্নবান্ হও এবং তাঁহার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।" ৫৭ ঃ ২৮

মানবের বিশ্বাস যদি তাহার কৃত-কর্ম্মে প্রতিফলিত না হয়, সে বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মানব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপ করিবে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের মূল ভিত্তিও এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। শের্ক অর্থাৎ সেই মহান্ আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের সহিত অন্য কোন কিছুর নাম সংযুক্ত করা কিংবা মনের কোণেও তাঁহার অংশীদার চিন্তা করা পবিত্র কোরআনে ঘৃণা সহকারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মহা পাপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ করিলে মানবের নৈতিক চরিত্র কলঙ্কিত হইবে এবং তাঁহার একত্ববাদ শিক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্য-মানবের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন, তাহাও বিফল হইবে। তাহার নামের গৌরব সাধনই—তাঁহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহার নাম গ্রহণাদি দ্বারা যে ভক্তিযোগ, ইহাই এই জগতের জীবগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া পবিত্র কোরআনের সম্পাদ্য বিষয়। তিনি এক অদ্বিতীয়, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম, অথচ সমস্ত স্বর্গে ও মর্ত্তে পরিব্যাপ্ত। পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকে মানবকে খলিফাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; মানবের ভিতর এমন কতকগুলি গুণ সেই মহান্ আল্লাহ্ কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং মানবকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে যে, মানব আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। ২ ঃ ৩০ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উপর মানবের স্থিতি, এমন কি স্বর্গীয় দূতগণও তাহার বশীভূত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে "এবং আমরা যখন স্বর্গীয় দূতগণকে বলিলাম তোমরা আদমের বশ্যতা স্বীকার কর, তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল; কিন্তু ইবলিস্ ইহা করিল না, সে অস্বীকার করিল এবং সে দাম্ভিক আর সে অবিশ্বাসিগণের মধ্যে একজন।"

২ ঃ ৩৪।একদিকে মহান আল্লাহ্‌ স্বর্গীয় দূতগণের দ্বারা মানবকে সত্য পথে চালিত করিতেছেন, অপর দিকে ইবলিস্ অর্থাৎ শয়তান অসৎপথে চালিত করিতেছে। এই শয়তানের প্রভাব হইতে অর্থাৎ অসৎপথ হইতে মানবকে রক্ষা করিতে এবং যাহা কিছু সত্য, তাহা মানব-হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে, পবিত্র কোরআনে যে সমস্ত বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জগতের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। আল্লাহ্‌র কত করুণা, সেই করুণার নিদর্শনস্বরূপ মানবের সুবিধার্থ তিনি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার উপর দিয়া তাঁহারই আদেশে মানব অর্ণবপোতে গমনাগমন করিবে এবং এই জন্য তুমি তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে। চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্ত চিহ্নই (তাঁহার করুণার চিহ্ন) বিশেষ প্রকারে প্রণিধানযোগ্য। ৪৫ ঃ ১২, ১৩।

যদি এই পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং মনুষ্যের উপর এই ক্ষমতা, এই কর্ম্ম-শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, যাহার সম্যক্ পরিচালনা করিয়া তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে নিজের বশীভূত করিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য করিতে পারেন, তিনি যদি সেই সমস্ত পদার্থকে পুনরায় ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং প্রকৃতির সেই সমস্ত উপাদান, যাহাদিগকে তাঁহার কার্য্যোপযোগী করিয়া আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে অবনত মস্তকে আল্লাহ্‌ জ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে তিনি কি অধঃপতনের নিম্নস্তরে পতিত হইবেন না? আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সপ্রমাণ করিতে কোরআন শরীফের এই সমস্ত বর্ণিত বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। এই মহা-ধর্ম্মগ্রন্থ এই প্রকার ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষায় পরিপূর্ণ। শের্ক—এই বাক্য ঘৃণা-সহকারে সর্ব্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ("যদি তুমি সেই মহান আল্লাহ্‌র

নামের সহিত কোন কিছুর নাম সংযুক্ত কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত কর্ম্মফল বৃথা হইবে এবং নিশ্চয়ই তুমি বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।” ৩৯ : ৬৫ “যে কোন মানব আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের সহিত অপর কোন নাম সংযুক্ত করিবে, তাহার অংশীদার কল্পনা করিয়া তাহার পূজা অর্চ্চনা করিবে, সেই ব্যক্তি ভ্রান্তির অতি নিম্নস্তরে পতিত হইবে।” ৪ : ১১৬। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের ভিতর মানবের স্থিতি অনেক উৰ্দ্ধে, ইহা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পবিত্র কোরআনে এই পরম সত্য অনেক যুক্তি-তর্ক দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রকার উক্তি পবিত্র পুস্তকে বহুস্থলে পরিদৃষ্ট হইবে। “কি আশ্চর্য্য, আমি সেই মহাপ্রভু আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর একজন প্রভুর সন্ধান করিব? তিনি সকল বস্তুর ও সকল প্রাণীর প্রভু।” ৬ : ১৬৫ ইহার পর শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে তিনি তোমাকে পৃথিবীর শাসনকর্ত্তারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। পুনরায় কথিত হইয়াছে, “কি আমি তোমার জন্য অপর একটি ঈশ্বরের সন্ধান করিব? যিনি তোমাকে তাঁহার সৃষ্ট সকল পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।” এই প্রকার তর্ক-বিতর্কের ভিতর যাহা পরম সত্য, তাহা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বর তাঁহার কর্ম্মোৎপাদিকা শক্তি দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন, তিনি স্ব-প্রকাশ এবং গুণ-প্রকাশক, তিনি সমস্ত বিশ্বের আত্মা, ভেদরহিত, অদ্বিতীয়। যে ব্যক্তি তাঁহার স্ববিকল্প প্রকৃতি দ্বারা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র ভেদজ্ঞান কল্পিত করে, তাহার মত জ্ঞানহীন মূঢ় এ সংসারে কে আছে? সে এই সংসার পথে অন্ধের মত নিয়ত পরিভ্রমণ করিবে, কোথাও বিশ্রাম করিবার স্থান পাইবে না। সকল পবিত্রতার আধার মহান্‌ আল্লাহ্‌র অনন্ত করুণা, তাই তিনি পাপের স্রোত হইতে অর্থাৎ বহুঈশ্বরবাদিত্ব মহাপাপ হইতে মানবকে রক্ষা করিতে মহানবী হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন। "নিরক্ষর মানবগণের মধ্যে তিনিই উদ্ধারকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদিগকে পাপের কালিমা হইতে মুক্ত করিতে তাঁহারই প্রত্যাদেশ-বাণী আবৃত্তি করিয়াছেন এবং সেই ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যদিও তাঁহার পূর্ব্বে তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল।" ৬২ ঃ ২ এই একত্ববাদ ও সর্ব্বজনীনত্ব প্রমাণ করিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ৭ ঃ৭

হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা উচ্চ আর কিছু নাই। যেমন সূত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে, তেমনি এই সমস্ত (জগত) আমাতে গ্রথিত। + + (১)

পবিত্র গীতাতে যেমন তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব, অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহার জ্ঞানের অগোচরে কোন বস্তুই নাই, পবিত্র কোরআনেও সেইরূপ ভাব সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব উভয় ধর্ম্ম-পুস্তকে সমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম-চেদহম্।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। ৩ ঃ ২৪

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক ভ্রষ্ট হইবে, আমি অব্যবস্থার কর্ত্তা হইব এবং এই লোকের নাশ করিব।

---

(১) জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন? কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ নিহিত। প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারক শঙ্করাচার্য্যের এই মত। গীতার মতে জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ধারণ করিয়াও তিনি জগতে অলিপ্ত। ৭ ঃ ২৫ এই মতের সহিত এছলাম ধর্ম্ম মতের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। এছলাম ধর্ম্মের মতবাদ এই ঃ—His knowledge extends over the heavens and the earth, and the preservation of them both tires Him not, and He is the most High, the Great. 2-255. Surely your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in six periods of time and He is firm in Power. 7-54.

গীতা এবং কোরআন একই ভাবে মানবকে অনুপ্রাণিত করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হইতে উৎসাহিত করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদি তাঁহারই সৃষ্টি, আমাদিগের সুবিধার জন্য সেই পরমকারুণিক আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হইতেছে। তাঁহাদের গতি-বিধি, উদয়, অস্ত সমস্তই তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি নিজে সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া মানবকে কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে উৎসাহ দিতেছেন। এক মুহূর্ত্ত অবসর লইয়া যদি তিনি কর্ম্মে লিপ্ত না থাকেন, তাহা হইলে এই সৃষ্টি-ব্যাপার অচল হইয়া যায়, মানব সেই মুহূর্ত্তে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই জন্য আমাদের তাঁহার নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদির উপাসনা কেবলমাত্র মনের ভ্রম, তিনিই তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী-দ্বারা আমাদের এই ভ্রম দূর করিয়াছেন আর তিনিই ইহাদিগকে আমাদের সুবিধার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সেই পরম-কারুণিক বিশ্বপতি আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র পূজ্য এবং উপাস্য।

অর্থাৎ আল্লাহর শক্তির সিংহাসন স্বর্গে ও মর্ত্তে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, কিছুই তাঁহার জ্ঞানের অগোচর নাই। এছলাম ধর্ম্ম এইরূপভাবে আল্লাহর সর্ব্বব্যাপকত্ব বা সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা প্রচার করে, কিন্তু "তিনি সকল বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে আছেন" এরূপ বলিলে আল্লাহর মহিমা খর্ব্ব করা হয়। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ আল্লাহর গুণ বা শক্তির বিকাশ। মানবের মধ্যে যে শক্তি (Divine Spark) নিহিত আছে, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানব আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাই বলিয়া আল্লাহ মানবের মধ্যে বা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আছেন এরূপ সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে বলা উচিত হয় না। যদিও তিনি ভিন্ন আমাদের কোন গতি নাই, সমস্তই তাঁহার সৃষ্টি, তাহা হইলেও যেখানে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট গুণাবলির বিচার হইয়া থাকে, সেখানে অপকৃষ্ট বিষয়ে তাঁহার মহিমান্বিত নাম সংযুক্ত করা কোন মানবের উচিত হয় না।

আল্লাহ্‌র এই একত্ববাদ এবং তাঁহার পূর্ণ মহিমা প্রচার করিবার জন্যই মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম। এই একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে মানব উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু মানব অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভুলিয়া যায় যে, পরমকারুণিক আল্লাহ্‌ তাহাকে সর্ব্বোত্তম উপাদানে গঠিত করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যখন তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তখন সে কি করিয়া তাঁহারই উপভোগের সামগ্রী সলিল, অনিল, অনল, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ মানবের এই ভ্রম দূর করিতে করুণাময় আল্লাহ্‌ যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে এই ধরণীতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি এই কর্ম্মজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যাহার গুণাবলি প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত সুগন্ধে সমস্ত জগত মোহিত করিয়াছিল, তিনিও কি মানবের নিকট পূজার্হ বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন? পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে, "ইহা হয় সেই (ধর্ম্ম) পুস্তক, যাহা প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি, যেহেতু তুমি তোমার প্রভুর অনুমতি অনুসারে মানবসকলকে অন্ধকার হইতে আলোকের পথে—সেই মহাশক্তিমানের পথে, সেই নিত্য প্রশংসিতের পথে আনয়ন করিতে পারিবে।"—১৪ : ১ তাই সেই পুরুষ-প্রবর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট বাণী, তাঁহার একত্ববাদ প্রচার করিয়া মানবকে অন্ধকার হইতে আলোকের পথে অর্থাৎ মানবের মানবত্ব ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার অহং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া উদাত্ত স্বরে জগতবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "লা, এলাহা, ইলাল্লাহ্‌" (১)। কি উচ্চ, কি

(১) আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই।

পবিত্র, কি মহৎ বাক্য! তিনিও সাধারণ মানবের মত সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সেবক, পরিচারক, ভৃত্য। তাহাদেরই মত রক্ত-মাংস-বিজড়িত, জরা-মৃত্যুর অধীন, কেবলমাত্র এইটুকু প্রভেদ, তিনি সেই বিশ্বপতি আল্লাহ্‌র বাণী মানবের কল্যাণার্থ, মানব-সমাজে প্রচারার্থ তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছেন। "মোহাম্মদ অর রসুলোল্লাহ্" (২)! "বল, আমিও তোমাদের মত জরা-মৃত্যুর অধীন মানব। আমি তাঁহারই দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রচার করিতেছি যে তোমার প্রভু সেই আল্লাহ্।" এই প্রকারে যিনি সেই আল্লাহ্‌র সহিত সংযুক্ত হইতে, তাঁহাতেই লীন হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশ্যই সৎকার্য্যে নিরত থাকিবেন, তাঁহার সেবাকার্য্যে অপর কাহারও সহিত তাঁহাকে সংযুক্ত করিবেন না। এই সম্পাত্ত বিষয় আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, ইহা হইতে উদ্ভূত এবং ইহাতেই সংশ্লিষ্ট মানবের একত্ববাদ। সমস্ত মানব সেই এক পরম পিতার সন্তান, তিনিই একমাত্র সমস্ত মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সাম্যবাদ বা একত্ববাদ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়া মানব সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে এবং ইহার অপেক্ষা গ্লানিকর ও নিন্দার্হ—"মানব মানবের দাস"—এই মানবের দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে। এই ঘৃণিত বন্ধন মুক্ত হইল যখন, তখন সেই মুক্ত মানব উদার প্রশস্ত আকাশতলে উন্নত বক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল, পবিত্র এছলামের শান্তির ধারা শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল, স্বাধীনতার অনিল, স্বাধীনতার সলিল, স্বাধীনতার অনল, স্বাধীনতার অনুভূতি তাহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত করিল, রুদ্ধ জ্ঞানমার্গ মুক্ত হইল, সে তখন ধীরপদে

(২) মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত।

অগ্রসর হইতে লাগিল। পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, "দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ মন কখন কোন মহৎ কার্য্যে সংযুক্ত হইতে পারে না, তাহার প্রতিভা বিকসিত হইবার পথ দাসত্বের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, যখন তাহার স্বাধীন সত্তা নাই, তাহার স্বাধীন চিন্তা করিবারও অবসর নাই।" এইজন্য এছলাম নির্দ্দেশ করিতেছে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে "সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে হইবে।" এছলাম প্রত্যেক মানবের প্রাণে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করিয়াছে, তাহার প্রাণের ভিতর স্বাধীনতার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। এইজন্য এছলাম গণতন্ত্রে অতি ক্ষুদ্র শ্রমিক মনে করিতে পারিত, সাম্রাজ্যে তাহার অধিকার আছে, সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাহার শক্তি এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ খর্ব্ব করিতে পারে না।

এই যে উপপাদ্য বিষয়—আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, যাহা পবিত্র কোর-আনে বর্ণিত ও বিশেষ প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার মূলে এই পরম সত্য নিহিত রহিয়াছে যে সেই মহান্ আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সৃজন পালন ও রক্ষাকর্ত্তা; তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং তাহা হইতে সকল প্রাণী সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানবের কর্ম্মশক্তি অপরিসীম, তাহার সম্যক্ প্রয়োগে মানব, প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া স্ববশে আনিতে পারে এবং তাহাদের দ্বারা তাহার সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে আর পৃথিবীতে সমস্ত মানবই সমান। এই সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি-ফলিত করিতে মুছলমানগণ আদিষ্ট হইয়াছে—একপক্ষে আল্লাহ্‌র উপাসনা, অপর পক্ষে তাঁহার সৃজিত সমস্ত পদার্থের সম্যক্ অনুশীলন। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া মুছলমানগণ উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন। "স্বর্গ ও পৃথিবীর

সৃষ্টি-ব্যাপারে এবং দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনে যে সকল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহাই তোমাদের সম্যক্ প্রকারে প্রণিধানযোগ্য।" ৩ : ১৮৯, ১৯০ জ্ঞানিগণের প্রকৃতি নির্দ্দেশক দুইটি বিষয়—সর্ব্বসময়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তাঁহার সৃষ্ট স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সমস্ত পদার্থের সম্যক্ অনুশীলন করা। এই অনুশীলন ব্যাপারের মূলতত্ত্ব বিজ্ঞান-চর্চ্চা। গবেষণা, সমীক্ষা, পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা দ্বারা মানব হৃদয়ে জ্ঞানের অঙ্কুর উদ্গত হয়, ক্রমে তাহা এরূপভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে যে সমস্ত জগৎ তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়। মুছলমানগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে তোমরা সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া যদি বিজ্ঞানচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে তিনি নৈতিক জীবনে উৎকর্ষ সাধন করিয়া, ঐহিক পারত্রিক জীবনে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিবেন।

এক্ষণে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অপর প্রতিপাদ্য বিষয়—তাঁহার অখণ্ডত্বের সহিত মানবের অখণ্ডত্বের একত্র সংমিশ্রণ। কিন্তু এই যে বিশ্বমানবের ভিতর ঐক্য-সংস্থাপন, যাহার মূল ভিত্তির উপর মানবজীবনের ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতি সমাহিত, তাহা এছলাম পুনরুদ্ধৃত হইবার পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন প্রত্যেক জাতির মনে এইভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাহারাই ঈশ্বরের সমধিক প্রিয়পাত্র এবং কেবলমাত্র তাহাদিগের জন্যই তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী প্রেরিত হইয়াছিল; জগতে অপর সকল জাতিই অধঃপতিত এবং আল্লাহ্‌র অপ্রিয়পাত্র, তখন কি করিয়া পরস্পরের ভিতর একতা ও সৌভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত

হইতে পারে এবং কি করিয়া ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। সেই সত্য সনাতন ধর্ম্ম এছলাম পুনরুদ্ধৃত হইয়া এই মহাসত্য বাণী ঘোষিত করিল, মানবের মন হইতে এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া মানবকে এক নূতন পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত করিল—"আমরা সকলেই সেই এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁহার সেবক।" তিনি কেবলমাত্র আমার নহেন, এ জাতির নহেন, ওজাতির নহেন, তিনি সকল জাতির, তিনি সকলের, সকল মানবের প্রভু, তিনি কেবলমাত্র আরবে, পারস্যে, কি ভারতে নহেন; তিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত। তিনি রাব্ব-উল-আলামিন, তিনি প্রভু, তিনি রক্ষক, তিনি পালক। তিনি স্বর্গের প্রভু, তিনি মর্ত্ত্যের প্রভু, তিনি পূর্ব্বের প্রভু, তিনি পশ্চিমের প্রভু, তিনি মুছলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী প্রভৃতি সমস্ত জাতির প্রভু, সমস্ত মানবের, সমস্ত প্রাণীর, সমস্ত জীবের প্রভু, তিনি শত্রুর প্রভু, তিনি মিত্রের প্রভু, তিনি মুছলমানের শত্রুরও প্রভু। ১ : ১ ; ৩৭ : ৫ ; ৭০ : ৪০ ; ৭৩ : ৯ আল্লাহ্‌র সেবক মহাপ্রাণ মোহাম্মদ বলিতেছেন "আমি তোমাদিগের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছি।" পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌ বলিতেছেন, "দুইজন ঈশ্বরকে গ্রহণ করিও না, আমি হই এক, একমাত্র আল্লাহ্‌, এইজন্য কেবল-মাত্র আমাকেই তোমরা ভয় করিবে। স্বর্গে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তিনিই তাহার একমাত্র অধীশ্বর, সেইজন্য তোমরা সর্ব্বদা তাঁহার বশীভূত থাকিবে।" ১৬ : ৫১ মহানবী আবার বলিতেছেন, "আল্লাহ্‌ আমাদিগের প্রভু, তোমাদিগেরও প্রভু। আমরা আমাদিগের কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিব, তোমরা তোমাদিগের কৃতকার্য্যের ফল-ভোগ করিবে।" ৪২ : ১৫ পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থে পুনরায় কথিত হইয়াছে,

"তুমি এখনও আল্লাহ্‌র বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবে? তিনি আমাদের প্রভু, এবং তোমাদেরও প্রভু। আমরা আমাদের কর্ম্মফল ভোগ করিব, তোমরা তোমাদের কর্ম্মফল ভোগ করিবে।" ২ঃ ১৩৯ পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকে আবার উক্ত হইয়াছে, "বল. যে প্রত্যাদেশ বাণী আমাদের নিকট এবং তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি। আমাদের আল্লাহ্‌ আর তোমাদের আল্লাহ্‌ এক, অভিন্ন, অদ্বিতীয়, ভেদাভেদ রহিত।" ২৯ঃ ৪৬

এই সাম্যবাদের সৌন্দর্য্য কি মধুর, কি প্রাণস্পর্শী, মহামানবের উদার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উদারতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নরোত্তম নবী তাঁহার প্রশস্ত বক্ষ মুক্ত করিয়া দিলেন, সহস্র বীণার মধুর ঝঙ্কারে মানবের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, এই আমার বুকের ভিতর চাহিয়া দেখ, এতটুকু সঙ্কীর্ণতা আমার এই হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে কি না, তোমরাই তাহার বিচার কর। আমি তোমাদেরই মত একজন মানব মাত্র, আল্লাহ্‌র বাণী,—তোমরা আমার ভাই, তুমি আর আমি একই পিতার সন্তান, এক স্নেহ-রসে অনুপ্রাণিত, একই উপাদানে গঠিত।" তিনি যেন অনন্ত শূন্যে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিলেন, "সেই মহান্ আল্লাহ্‌ যেমন এক, তেমনি সমস্ত মানবও এক।" মানবে মানবে মতানৈক্য হইতে পারে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি, সবই হইতে পারে; কিন্তু তাহারা সকলেই এক পিতার সন্তান, তাহাদের প্রভু এক, সেই বিশ্বস্রষ্টা মহান্ আল্লাহ্‌; এবিষয়ে দ্বিতীয় মত থাকিতে পারে না। কোন জাতি বিশেষের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ কি ভালবাসা থাকিতে পারে না, তাঁহার পক্ষপাতশূন্য অন্তরে সমস্ত মানব, সমস্ত জাতি তাঁহার ভালবাসার পাত্র। তাঁহার আশীর্ব্বাদ,

তাঁহার উপদেশ সকল জাতি সমভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত মানবই এক সম্প্রদায় ভুক্ত, এক জাতি। এ মতে আল্লাহ্ সুসংবাদের ও সতর্ক-কারীর অগ্রদূত স্বরূপ ধর্ম্মোপদেষ্টা উদ্ধারকর্ত্তাগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। ২ঃ ২১৩ "মনুষ্য আর কিছুই নহে, তাহারা এক জাতি ভুক্ত।" ১০ঃ ১৯ "এই মহতী বাণী স্বর্গ হইতে পুনরায় প্রেরিত হইল; পৃথিবীর সমস্ত মানব এক জাতি ভুক্ত, এক পরিবার ভুক্ত। জাতি বিভাগ, শ্রেণী বিভাগ, সম্প্রদায় বিভাগ সেই অখণ্ড মানবত্বের একতার মূলে এতটুকু আঘাত করিতে পারে নাই। হে মানবগণ

* আমরা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। এজন্য আমরাই গোত্র ও বংশ সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তি বিশেষরূপে সম্মানার্হ হইবেন, যে ব্যক্তি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে বিশেষরূপে যত্নশীল হইবেন।" ৪৯ঃ ১৩ এই অখণ্ড মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ যেদিন আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিন আমাদের অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিবে যে, আমরা সকলেই সেই একই সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তাঁহারই প্রজা, তাঁহারই সন্তান আর তাঁহারই পরিচারক। যদি আমরা এই ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়-মধ্যে বিশ্ব প্রেম আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জাতি-বিদ্বেষ, এই হিংসা-কলহের মূলে সেই দিনেই কুঠারাঘাত হইবে, আমরা সকলেই শান্তির ও উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব।

হিন্দুর অসংখ্য ধর্ম্ম-পুস্তকের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-পুস্তক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তকে মানবের

বিশ্বজনীনত্ব সম্বন্ধে মহামানব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। ৬ ঃ ২৯

সকল সমত্ব প্রাপ্ত যোগী নিজেকে ভূতমাত্রে এবং ভূতমাত্রকে নিজের ভিতর দেখেন।

সমস্ত আরব কেন, সমস্ত পৃথিবীর মানব যখন অধর্ম্মচালিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিল, সেই সময় মহামানব মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই সাধক-প্রবর মহা-যোগী মহান্ আল্লাহ্‌র আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের বেদনার ভার লাঘব করিবার জন্য আপনার প্রশস্ত হৃদয়-দর্পণে তাহাদিগকে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন। একটি মক্ষিকার প্রাণে আঘাত লাগিলে যাহার প্রাণ কাতর হয়, বিশ্ব-মানবের দুঃখে তাঁহার মহা-প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তাই তিনি তাঁহার প্রাণের দ্বার মুক্ত করিয়া বিশ্ব-মানবকে দেখাইলেন যে তাহাদের দুঃখে তাঁহার সহানুভূতির স্রোত তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। জগতের লোক দেখিতে পাইল মানবত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ। আত্মীয় নাই, পর নাই, শত্রু নাই, মিত্র নাই, তাঁহার করুণার ধারা সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত হইল, মানব যেন সেই ধারায় অভিষিক্ত হইয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধে আর কোন ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে না। ঈশ্বরভক্ত যোগী তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায়, সৃষ্টির সর্ব্বত্র, সকল পদার্থে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করে। হজরত মোহাম্মদেরও (দঃ) এই অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল, তাই তিনি যে

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, তাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহাকে বুঝিতেন আর তাঁহাকে মনে মনে অনুভব করিতেন। সেইজন্য তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সেই পরম-কারুণিক মহান্ আল্লাহ্‌র দৃষ্টির অন্তরালে ছিলেন না। তাঁহার সমস্ত মন আল্লাহ্‌র ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এই ভাব-প্রণোদিত হইয়া তিনি হীরার গুহাভ্যন্তরে তাঁহার মিত্রোত্তম হজরত আবুবকরকে বলিয়াছিলেন "কেন, আমরা যে তিনজন, তুমি আমি আর আল্লাহ্"। কত বড় বিশ্বাস, কত বড় সাধনা, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, প্রাণ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, "ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বতঃই হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়া যায়। করুণাময় আল্লাহ্ তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা যেন অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হয়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বর এক, অভিন্ন, অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহাকে উপাসনা করে, সে তাঁহাতেই সর্ব্বদা বিলীন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও এই ভাব অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান, চেতন, সচেতন, প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক, সকল পদার্থ, সকল প্রাণী, স্থাবর, জঙ্গম, বন, উপবন, পাহাড় পর্ব্বত সকল স্থানে তিনি নিত্য বিরাজমান। মহামানব মোহাম্মদও (দঃ) তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেন অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র অনুভব করিতেন। অসহায় নবী শত্রু-বেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে বদরের এবং ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ। ৬ঃ৩২

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় সকলকে দেখে এবং সুখ ও

দুঃখ সমান ভোগ করে সেই যোগীকে শ্রেষ্ঠ যোগী বলা যায়। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সকল মানবকে সমান দেখিতেন, সুখ-দুঃখে অবিচলিত থাকিতেন, সেইজন্য তাঁহাকে যোগিশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

হিন্দু-ধর্ম্মের মূলেও সেই একেশ্বরবাদ, ঈশ্বরের একত্ববাদ ও মানবের একত্ববাদ। কোন মানব কোন মানবের চক্ষে ঘৃণ্য নহে, সমস্ত মানবই সেই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, সুতরাং পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। হিন্দুর ভিতর এই যে বর্ত্তমান জাতিভেদ, ইহা কখনই ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। মানব মানবের অস্পৃশ্য, মানবের চক্ষে মানব ঘৃণ্য, ইহা হইতে অধঃপতন আর কি হইতে পারে? যে মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে অহংবাদ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমি উচ্চ আর একজন আমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ধর্ম্মের চক্ষে সেই মুহূর্ত্তে অধঃপতন হইবে।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ১৮ঃ২৬

যে ব্যক্তি কুসঙ্গ-রহিত, নিরহঙ্কার, যাহার মধ্যে দৃঢ়তা ও উৎসাহ আছে, যে সফলতায় ও নিষ্ফলতায় হর্ষ শোক করে না, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে।

মহামানব মোহাম্মদ কুসঙ্গ-রহিত ছিলেন। তিনি যদি কদাচারী লোকের সংস্পর্শে আসিতেন, তাহাকে সদাচারী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, যদি সফল মনোরথ না হইতেন তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারে না যে, তিনি অহঙ্কারী ছিলেন। সমস্ত জীবনে তিনি দৃঢ়তা ও উৎসাহের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সফলতায় ও নিষ্ফলতায় তিনি হর্ষ কি দুঃখ প্রকাশ করিতেন না, সর্ব্ব-সময়ে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যে অবহিত থাকিতেন। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি সাত্ত্বিক-ভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মানব-হৃদয়ের উচ্চতা ও নীচতা তাহার কার্য্যের দ্বারায় প্রকাশ পায়, তাহার প্রবৃত্তিতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জন্মগত অধিকারে উচ্চজাতির গৌরব লাভ, ধর্ম্মের অনুশাসনে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না।

এছ্লামের মূলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং তৎসঙ্গে মানবের একত্ববাদ, হিন্দু-ধর্ম্মের মূলেও এই একত্ববাদ। সুতরাং যিনি উভয় ধর্ম্ম বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে উভয় ধর্ম্মের মূলভিত্তি—এই একেশ্বরবাদিত্বের উপর সংস্থাপিত এবং উভয় ধর্ম্মের গূঢ় উদ্দেশ্য—মানবত্বের সাম্যবাদ প্রচার করা।

হিন্দুগণ কেন মাটির পুতুল গড়াইয়া কিংবা প্রস্তর খোদিত করিয়া তাহাকেই ঈশ্বরের প্রতীক স্বরূপ পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে আমরা তর্ক তুলিতে চাহি না, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক কথা বলিবার আছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—হিন্দু-ধর্ম্ম কখনই "পৌত্তলিকতার" সমর্থন করে না। হিন্দুধর্ম্মের মূলে যে একেশ্বরবাদ, হিন্দুর বহু ধর্ম্মপুস্তকে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা কয়েকটি শ্লোক ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত করিলাম।

(মহামুনি শ্রী ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণ রচনা করিবার পর সে গুলিতে ঈশ্বরের সাকাররূপ কল্পনা করার দরুণ তাঁহার যে অপরাধ হইয়াছিল, তাহার জন্য নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

> "রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো
> ধ্যানেন যৎ কল্পিতং।
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাহ খিল গুরো
> দূরীকৃতা যন্ময়া॥

ব্যাপিতঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো
যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা
দোষত্রয় মৎকৃতম্‌॥

"তুমি রূপ বিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তব দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তুমি সর্ব্বব্যাপী কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপিকত্ব নিরাকৃত করিয়াছি। অতএব, হে জগদীশ, তুমি আমার এই বিকলতা দোষত্রয় ক্ষমা কর।"

অতএব দেখা যাইতেছে ঋষিগণ কোন কালেই সাকারবাদী ছিলেন না, বরং ঈশ্বরের সাকাররূপ কল্পনা করা তাঁহারা অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন।

(অধ্যাপক শ্রী মন্মথমোহন বসু এম, এ কৃত "আমিও আমার দেহ" ১৩৫ পৃষ্ঠা।)

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম।" ১৮ঃ২২ (গীতা)

"কোন একটি মাত্র কার্য্যে যে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ মনুষ্যে কিংবা প্রতিমাদি জড় পদার্থে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা কি উপাসনা তাহা নিরুপপত্তিক, পরমার্থ অবলম্বনশূন্য এবং তুচ্ছ। ইহাকেই তামস জ্ঞান বলিয়া কথিত হইয়াছে।" অজ্ঞান মানবেরই ঐরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদান্ত পঞ্চদশীর পঞ্চকোষ বিবেকের ১৯ এবং ২০ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ঃ—

"বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম॥" ১৯

"জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্ত্যুক্তি র্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥" ২০

অর্থাৎ "যাহারা জ্ঞাত অজ্ঞাত হইতেও অতীত সেই পরম ব্রহ্মকে বোধগম্য করিয়াও অনুভব করিতে পারে না, তাহারা নরাকৃতি মৃৎপিণ্ড বিশেষ। জড় পদার্থের ন্যায় তাহারা সকল কার্য্যের অযোগ্য পাত্র। তাহারা কখনই পরমাত্মা তত্ত্ববোধের অধিকারী হইতে পারে না। যিনি সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম, তিনি কিছুতেই আমাদের বোধগম্য নহেন, এ কথাও কদাচ সঙ্গত নহে। কারণ যদি কেহ বলে যে আমার জিহ্বা আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, তাহা হইলে ঐ কথা সেই ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ লজ্জাজনক, সেইরূপ ঈশ্বরকে আমি জানি না বা ধারণা করিতে পারি না এই কথা বলাও সেইরূপ লজ্জাজনক।"

"আত্মা সাক্ষী বিভুঃপূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥ ১১৫
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৬
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাং চেন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥ ১১৮
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং নযান্তিতে॥" ১১৯

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ১৪ উল্লাসঃ।

আত্মা সাক্ষী, বিভু, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, পরাৎপর এবং দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নয়, ইহা জ্ঞাত হইলে মুক্তিলাভ হয়। যে ব্যক্তি নাম ও রূপাদি কল্পনাকে বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনি মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মনে মনে কল্পনা করিয়া মূর্ত্তি গড়াইয়া

পূজা অর্চ্চনা করিলে, তাহাতে মুক্তিদান করিতে পারে না, স্বপ্নে যেমন রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তাহাতে রাজা হইতে পারে না। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু অথবা কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত প্রতিমাসমূহে ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিয়া মূর্খ তপস্বীরা বৃথা কষ্টভোগ করিয়া থাকে, তাহারা তপঃ-জ্ঞান-সম্ভূত তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি লাভ করিতে পারে না।”

মহাভারত অনুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন “হায় পৌত্তলিকতা, কি শুভদিনেই এখানে (ভারতে) পদার্পণ করিয়াছিল। এত দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও, আমরা তাহা পরিত্যাগ কর্ত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্ছি। ছেলেবেলায় যে পুতুল নিয়ে খেলাঘর পেতেছি, বৌ বৌ খেলেছি ও ছেলে-মেয়ের বে দিয়েছি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর ব’লে পূজা কচ্ছি। তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্ছি, ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাকছে না। শুধু আমরা কেন—কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী, সংসারের সভ্য বাবুরাও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত থেকেও, হয়ত সমাজ না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে পুতুল পূজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাদা-রক্ত মেখে কোলাকুলি করেন। কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবুও জগদীশ্বর একমাত্র ইহা জেনে আবার পুতুল পূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।”

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং বহু শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ স্যার হরি সিং গৌর মহাবোধী পাত্রিকায় (এপ্রেল ১৯৩২) হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, “পৌরহিত্য প্রথা, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদিত্বের পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলে যে সত্যই হিন্দু-জাতির বিরাট উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ কিছুই নাই।”)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার এম, এ মহাশয় লিখিয়াছেন, (১) "পৌত্তলিকতার হাত হইতে জগতকে রক্ষা করিবার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। পৌত্তলিকতা দূর করাই মুছলমানের প্রধান ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কার্য্য বলে মনে করি। মুছলমান, আজ আমাদের সাহিত্য ও স্বদেশিকতাকে এই অশুভের হাত হতে তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। শুধু এ দেশের স্বদেশিকতা নয়, পাশ্চাত্য দেশে স্বদেশিকতা যে বিকৃত অবস্থায় এসে সমস্ত জগতের মহাত্রাস উপস্থিত করেছে, সেই স্বদেশিকতা যদি কেউ সুপথে আনতে পারে, তাহা মোছলেমের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ। মানুষের আদর্শ—কেবল মাত্র তাহার ক্ষুদ্র স্বদেশের গণ্ডী নয়, আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যের বিষয় ও কাম্য—বিশ্ববাসীর মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রেম। স্বদেশ—সেই সুদূর গন্তব্য স্থানে যাবার পথে মাত্র অস্থায়ী সরাইখানা। বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে অনেকে উদ্দেশ্য হারিয়ে, লক্ষ্য হারিয়ে, এই সরাইখানাতেই স্থায়ী ঘর বেঁধে বসে পড়েছে। এই ভুল ভাঙতে পারে, এক মাত্র উদার ইসলাম-ধর্ম্ম—তার বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দিয়ে। সুতরাং সম্পূর্ণ নূতন ভাবে স্বদেশিকতা রচনা কর্ত্তে হবে, যার মধ্যে পৌত্তলিকতার পূতি গন্ধ থাকবে না, অন্তর্নিহিত ধ্বংসের বীজও থাকবে না। মুছলমান অভিনব বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি এই মহান্ কার্য্য সম্পাদন কর্ত্তে পার, তবেই বুঝবো তোমরা ঈশ্বর—নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত কার্য্য করেছ। আর তাতে যে শুধু মুছলমানের মঙ্গল নিহিত আছে, তা নয়, হিন্দুও নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হবে। হিন্দু ও মুছলমান উভয়ের উপরই আমাদের দেশের কল্যাণ নির্ভর কচ্ছে। যা কিছু ছোট, যা কিছু

(১) এই পুতুল পূজা দোষের কেন? যা কিছু ছোট, যা কিছু দুর্ব্বল, তাই অকল্যাণ কর। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করা, শুধু সীমাবদ্ধ নয়, সেই সসীমকেই পরম ব্রহ্ম বলে স্বীকার করা—এইটাই দোষের। পুতুল ছোট, পুতুল শক্তিহীন—তাই পুতুল পূজা নিন্দার্হ।

অকল্যাণকর, সে সমস্ত বর্জ্জন করে যদি আমরা বিশ্বের কল্যাণের জন্য তপস্যা করি, তাহলে জগতের নিয়ন্তা আমাদের সাধু প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই জয়-মণ্ডিত কর্ব্বেন।" (সওগাত, কার্ত্তিক, ১৩৩৪)

কবীন্দ্র রবীন্দ্র মধুর বীণা ঝঙ্কৃত করিয়া গাহিয়াছেন।—

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্ন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে।
ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকায়ে রাখিস আপন মনে।
চির দিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে।
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে।"

পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের মূলেও একেশ্বরবাদিত্ব। মহামতি যীশুর প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলেও এই একেশ্বরবাদিত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া এই একেশ্বর বাদ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরে ত্রিত্ববাদিত্ব নীতি অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সেইরূপ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, তিনে এক, একে তিন, এই ত্রিত্ববাদ (Trinity) নামক পরচ্ছন্দ পবিত্র বাইবেলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞান-ভাণ্ডার পাপ কলুষিত করিয়াছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে "সাবেনীয়" নামে এক খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উহা গঠিত হয়। (১) ইহা ভিন্ন বাইবেলের বহু অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা খৃষ্ট ধর্ম্মের বহু বিজ্ঞ নেতা বিশদভাবে প্রমাণ

---

(১) শ্রীযুক্ত যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস কৃত ইস্লাম দর্শন নামক পুস্তকের ৩য় পৃষ্ঠা এবং রোমান ইতিহাস ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বাইবেল পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইতেছে। সম্প্রতি রিভিসন কমিটি (Revision Committee) এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the holy Ghost; and these three are one. (I John 5 verse 7) খৃষ্ট ধর্ম্মের এই ত্রিত্ববাদিত্ব নীতি বাইবেলের আদি পুস্তকে কোথাও ছিল না, অতএব ইহা নিশ্চয় প্রক্ষিপ্ত। সেই জন্য রিভিসন্ কমিটী (Revision Committee) ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আগষ্টাইন ক্যালমেট (Augustine Calmet) স্বীকার করিয়াছেন যে এই ত্রিত্ববাদিত্ব নীতি বহুকাল পরে ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া জগত সমীপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই নীতি মানবের সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত, যেহেতু তিন কখন এক হইতে পারে না, আর এক কখন তিন হইতে পারে না। তিনে এক, একে তিন, এই উক্তি বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ উক্তি বলিয়া ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকটও বিবেচিত হইবে; কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকগণ যথা নিউটন, গীবন, পারসন প্রভৃতি মনীষীগণ এই দুর্ব্বোধ্য ত্রিত্ববাদ (Trinity) কখন স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের একত্ববাদ যে বাইবেলের মূল মন্ত্র, তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনস্বী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, তাঁহার "আমিও আমার দেহ" নামক পুস্তকে এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনে এক বলিয়া এবং বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্রহ্মের গুণবাচক বিশেষণ বলিয়া বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন

("আমার সমক্ষে তোমরা অন্য দেবতা মানিবে না, তোমরা কোন খোদিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে না, কিম্বা স্বর্গীয় কোন বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করিবে

না। তোমরা তাহাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিবে না, কিম্বা তাহাদের সেবা করিবে না।" (ডিউটারোনমি ৬, ৭, ৮, ৯ পদ, প্রাচীন বাইবেল ২য় পুস্তক)।)

"অতএব উর্দ্ধস্থ স্বর্গ ও অধঃস্থ পৃথিবীতে পরমেশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই, ইহা তোমরা অদ্য জ্ঞাত হও ও আপন আপন অন্তঃকরণে বিবেচনা কর।" (ডিউটারোনমি ৪র্থ অধ্যায়, ৩৯ পদ)

"হে ইসরাইল বংশভুক্ত মানবগণ, শোন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর।" (ডিউটারোনমি ৬ অধ্যায়, ৪ পদ)

"আমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, আমা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই; আমি যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ইহা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্য অস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত লোক জ্ঞাত আছে। (যীশারীয় ৪৫ অধ্যায় ৫, ৬ পদ)

(যীশু নিজে বলিতেছেন, "যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে, তাহারা সকলে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না,' কিন্তু যাহারা আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে অর্থাৎ কেবল মাত্র ঈশ্বরের ভজনা করে, তাহারাই পারিবে। সেইদিনে (বিচারের দিনে) অনেকে আমাকে কহিবে হে প্রভু, হে প্রভু, আমরা কি তোমার নামে ভাবোক্তি প্রকাশ করি নাই, তোমারই নাম করিয়া শয়তানকে বিতাড়িত করি নাই, তোমার নাম করিয়া অদ্ভুত বিস্ময়জনক কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিব—হে দুষ্কর্ম্মকারিগণ, তোমরা আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।" (মথি ৭ম অধ্যায় ২১, ২২, ২৩))

একজন লেখক আসিয়া তাহাদিগকে তর্ক-বিতর্ক করিতে শুনিলেন এবং অনুভব করিলেন যে তিনি তাহাদিগকে সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন আজ্ঞা প্রধান?" যীশু উত্তর দিলেন, "সকল আজ্ঞার মধ্যে প্রথম আজ্ঞা এই—

শোন হে ইসরাইলগণ, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একই প্রভু এবং তুমি সেই প্রভু তোমার ঈশ্বরকে সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন, সমস্ত শক্তি দিয়া ভালবাসিবে (তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিবে)।” মার্ক ১২ অধ্যায় ২৮, ২৯, ৩০

মহামতি যীশু কখন নিজেকে কেবল মাত্র ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বর যেমন সমস্ত মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা, সমস্ত মানবের পিতৃস্থানীয়, তেমনি তাঁহারও সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং পিতৃস্থানীয়। (একজন ভূম্যধিকারী “প্রভু, তুমিই সৎ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তিনি তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, “একমাত্র ঈশ্বরই সৎ হইতে পারেন, পৃথিবীতে কোন মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সৎ হইতে পারে না।” লূক ১৮, ১৯ যীশু) সাধারণ লোকদিগকে সরলভাষায় বুঝাইয়া দিতেন ঈশ্বর সকল মানবেরই পিতা, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্, তাঁহার আজ্ঞা সম্যক্‌রূপে পালন করিয়া থাকেন, তিনিই ঈশ্বরের সৎপুত্র। তিনি নিজেকে যেমন ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মনে ভাবিতেন, সেইরূপ সকল মানবকেই তাঁহার সন্তান মনে ভাবিতেন। “তোমাদিগকে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তোমাদের পিতা জ্ঞাত আছেন, যাহা তোমাদের আবশ্যক।” মথি ৬ঃ ৮.

পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ বাণী দ্বারা মুছলমানগণ দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর সকল নবী অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষগণ একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ তাঁহাদের মতগুলি পরিবর্ত্তন ও বিকৃত করিয়া সত্যপথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্ম-পুস্তকগুলিও বিকৃত করিয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত সংশোধন করিতে এবং মানবকে অসত্যের পথ হইতে উদ্ধার করিতে মহাপ্রাণ হজরত মোহাম্মদ আবির্ভূত হইলেন—যেন মরুভূমির

দগ্ধ-বক্ষে অমৃতধারা বর্ষিত হইল। ঐ সম্বন্ধে চিন্তাশীল পাঠকগণের অনুধাবনের ধন্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ—

"হে মোহাম্মদ, লোকদিগকে বলিয়া দাও 'হে গ্রন্থের অধিকারিগণ বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহারও পরিচর্য্য কর, যাহার তোমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার, তোমাদিগের কোন ক্ষতি করিবার, কি তোমাদিগকে কোন উপলভ্য দান করিবার কোন শক্তি নাই; (তোমাদের বাক্যাবলি) তিনিই শ্রবণ করিতেছেন, (তোমাদের কার্য্যসমূহ) তিনিই জ্ঞাত আছেন।' বল, 'হে মহাগ্রন্থের ভাবগ্রাহিগণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অমিতাচারী হইও না, তোমাদিগের পূর্ব্বে যাহারা সত্যপথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, বহু লোককে তাহারা পথভ্রষ্ট করিয়াছে, এবং নিজেরাও সত্য পথ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে।" ৫ঃ ৭৬, ৭৭

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নামে সর্ব্বস্ব ত্যাগ,—

"বল, নিশ্চয়ই আমার উপাসনা, আমার কোরবানী (ত্যাগ), আমার জীবন, আমার মরণ সমস্তই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি এই পৃথিবীর প্রভু।" ৭ ঃ ১৬৩

আল্লাহ্‌র এই একত্ববাদের স্বরূপ অর্থাৎ সাধনা—আল্লাহ্‌তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, তাহার প্রাণের দ্বার মুক্ত করিয়া তাহার মহাপ্রভুকে নিবেদন করিবে—"হে বিশ্বনিয়ন্তা, আমি তোমারই আজ্ঞাবাহক ভৃত্য, তোমারই কার্য্য করিতে জীবন-ধারণ করিয়া আছি, আর তোমার জন্য যেন মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি।" ইহার প্রকৃত ভাবার্থ আমার জীবন আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করা অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট মানবকে ভালবাসা আর তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করা। এই কার্য্য করিতে এছলাম সকল মানবকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিতেছে। মহামানব তাঁহার

জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে ইহার অনুরূপ শ্লোক :—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥" ৯ : ৩৪

"আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর, আমাকেই নমস্কার কর, আমাতে যুক্ত হইয়া আমা পরায়ণ হইলে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" ইহাও এছলাম অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা।

পুনশ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে :—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ৯: ২৭

"হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।"

মানব তাহার সত্তা তাঁহাকে বিলিয়ে দিয়ে তাহার অহংজ্ঞান যদি একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তখন সে নিশ্চয়ই এছলামের শান্তি পাইবে। এই এছলাম ধর্ম্ম বহু পুরাতন, সত্যসনাতন ধর্ম্ম। হজরত এব্রাহিমের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই কথা সপ্রমাণ করিতেছি।

মহাত্যাগী হজরত এব্রাহিম, হজরত ইয়াকুব, তাঁহাদের সন্তানদিগের প্রতি এইপ্রকার আদেশ দিয়াছিলেন "হে আমার পুত্রগণ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই এছলাম ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, অতএব যে পর্য্যন্ত তোমরা মুছলমান না হও, সে পর্য্যন্ত মরিও না।" ২ : ১৩০, ১৩২

"বল, আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি, এবং যাহা আমাদিগের নিকট প্রত্যাদেশ বাণী বলিয়া প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহা এব্রাহিম, ইসমাইল,

আইজাক, জেকব এবং সেই সমস্ত জাতিকে প্রত্যাদেশ বাণী বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যাহা হজরত মুছাকে ও যীশুকে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং যাহা প্রভুর নিকট হইতে তাঁহারই প্রেরিত নবীগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য কি বিভিন্নতা অনুভব করি না এবং আমরা একমাত্র সেই মহান্ আল্লাহ্‌র বশীভূত।” ২ঃ ১৩৬

জগতে মানবের ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না, পবিত্র কোরআনে এই শ্লোকের দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই উদার বাণী জগতে সমস্ত মানবের মধ্যে একত্ববাদ প্রচার করিয়া সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহারা যেন তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখাইতে পারে “দেখ পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র নিরপেক্ষতা, তিনি তোমাকে যে উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও সেই উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছেন।” তিনি যেন মানদণ্ড দ্বারা ওজন করিয়া মনুষ্য-প্রকৃতি গঠিত করিয়াছেন। এই শ্লোকের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যেক মুছলমান সকল লোককে প্রীতির চক্ষে দেখিতে, তাহাকে আপনার বলিয়া আদর করিতে বাধ্য। এইখানেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-প্রেম। যখন নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, সকল নবীই যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র, তখন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বিগণ কেন মুছলমানের ভালবাসার পাত্র না হইবে। আবার বলিতেছি এইখানেই এছলামের সৌন্দর্য্য সমস্ত পৃথিবীর বক্ষে প্রস্ফুটিত; মুছলমানের স্বজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, মুছলমানের স্বজাতি বিশ্বের সমস্ত মানব, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আকাশের মত প্রশস্ত করিয়া সে যদি সমস্ত জগতের মানবকে ভালবাসিতে না পারে, সমস্ত মানবকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে মুছলমান নামের অযোগ্য, এছলামের ভাব তাহার অন্তরে পরিস্ফুট হয় নাই।

যেখানে কলহ, যেখানে বিবাদ, যেখানে দ্বেষ হিংসা, হিংসার শাণিত কৃপাণ উত্তোলিত, মুছলমান সেইখানে অগ্রসর হও, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় প্রস্ফুটিত কর, আকাশের মত বিস্তৃত কর, পর্ব্বতের মত উচ্চ কর, সমুদ্রের মত গভীর কর, কোরআনের ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, এক অধ্যায়ের ভাব, একটি ক্ষুদ্র অক্ষরের ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, মহানবীর অন্তরের ছায়া তোমার অন্তরে পতিত হক, তখন জগতের লোককে দেখাতে পার্ব্বে সকল অশান্তি দূর হয়ে গেছে, শান্তির স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তখন সমস্ত লোক সেই স্রোতে ভেসে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত কর্ব্বে "জয় মহান্ আল্লাহ্‌র জয়, জয় মহানবীর জয়।"

আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, হিন্দু ও মুছলমান ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব এক ঈশ্বরবাদ, উভয় ধর্ম্মের মূলে একই ভাব, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে ভালবাসা এবং তাহাদের মধ্যে সাম্যবাদ রক্ষা করা। নিরপেক্ষ ভাবে উভয় ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে,—শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন :—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ৪ : ৮

প্রাচীন যুগের এই আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিতে আদর্শ মহাপুরুষ মোহাম্মদের জন্ম। সেই সময় ভারতে কুরুকুল যেমন অধর্ম্ম স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, আরবে কোরেশ প্রভৃতি জাতি সেইরূপ অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিল। তাই মহাপুরুষ মোহাম্মদ অধর্ম্মের সংহার করিতে, দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করিতে এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে কেহ যেন না মনে করেন "সম্ভবামি" অর্থে ঈশ্বর স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিবেন। তখন ঈশ্বর যেমন তাঁহার ভাবাবিষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহান্ আল্লাহ

পবিত্র আত্মা মোহাম্মদকে তাঁহার ভাবাবিষ্ট করিয়া আরবে প্রেরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর যে জন্ম রহিত, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকে প্রমাণিত হইতেছে।—

"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" ১০ঃ৩

এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, গীতার শ্রীভগবানুবাচ শব্দের অর্থ তাহার বাক্যাবলী মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে ব্যক্ত করিতেছেন, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী মোহাম্মদের মুখ-কমল হইতে তাঁহার ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। অথবা ঈশ্বর ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করা হিন্দুদিগের চক্ষে দোষাবহ নহে। করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা চিরদিনের জন্য রক্ষিত হউক।

এছলামে উপাসনা-বিধি—অল ফাতেহা কিংবা ফতেহাত উল কেতাব—এক অধ্যায়ে মাত্র সাতটি শ্লোকে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, "বিছমিল্লাহ্ হের্ রাহমানের রহিম।" ইহার অর্থ—যিনি অসীম দাতা, অনন্ত করুণাময়, আমরা সেই আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করি। প্রত্যেক মুছলমান তাঁহার দৈনন্দিন প্রত্যেক কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এই কয়টি বাক্য উচ্চারণ করিবে। এই কয়টি বাক্য প্রত্যেক মুছলমান সন্তানের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার বিষয় এবং তাহার স্মৃতির ফলকে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করাও অত্যাবশ্যক। বিছমিল্লাহ নাম স্মরণ না করিয়া মুছলমান কোন কার্য্য করিতে পারে না, করাও তাহার উচিত নহে।

নমাজ বা উপাসনা সম্বন্ধে ফাতেহা ছুরার বিশেষ গুরুত্ব এবং প্রতিবার উপাসনার সময় ইহার অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সার্ব্বজনীন

অথবা ঐকক উপাসনায় সর্ব্ব সময়েই ইহাকে কোরআন প্রসবিত্রী বলিয়া মুছলমানগণ ইহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র বাক্য কয়টির ভিতরে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার ভিতরে কি গভীর তত্ত্বজ্ঞান প্রকটিত হইয়াছে, তাহা এছলামের বন্ধু কি শত্রু কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। মানবের বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখে আত্ম-নিবেদন করিবার ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অন্য কোন উপাসনায় পরিলক্ষিত হইবে না। ইহার সাতটি শ্লোকের ভিতর প্রথম চারিটি শ্লোকে আল্লাহ্‌র প্রধান গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে যথা আল্লাহ্‌র অনন্ত প্রেম, তাঁহার গভীর ভালবাসা, তাঁহার অপার করুণা, তাঁহার প্রতিদান অর্থাৎ বিচারে শাস্তি কি পুরস্কার প্রদান। আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নমাজের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম প্রার্থনা—"হে আল্লাহ, তোমার মহিমা সতত কীর্ত্তিত, তুমিই একমাত্র প্রশংসাভাজন, তোমার নাম সর্ব্বদা পবিত্র এবং তুমি মহা-মহিমান্বিত। তুমি ভিন্ন আর কাহার পরিচর্য্যা করিব, আমি তোমার আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করিতেছি, অভিশপ্ত শয়তানের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য।"

"পরম কারুণিক আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অনন্ত প্রেমময় করুণাময়. সমস্ত প্রশংসার পাত্র একমাত্র আল্লাহ্‌। তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু, তুমি পরম করুণাময় কৃপানিধান, আমাদের শেষের দিনের বিচারকর্ত্তা (বিচারে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদাতা) আমরা একমাত্র তোমারই অর্চ্চনা করি, তোমার নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদিগকে ন্যায়, সত্য ও সরল পথে চালিত কর, যাহাদিগের উপর তুমি করুণা বিতরণ করিয়াছ তাহাদিগের পথে,

যাহাদিগের উপর তোমার ক্রোধ সঞ্চারিত হইয়াছে কিংবা যাহারা সত্য-পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের পথে নয়।"

"হে আল্লাহ্, আমার প্রভু, মহান্ গরীয়ান্ প্রভু, তোমার মহিমা এই পৃথিবীতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।"

"আল্লাহ্ তাহাকেই গ্রহণ করেন, যিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ প্রদান করেন।"

"হে সর্ব্বোচ্চ-মহিমান্বিত মহাপ্রভু, তোমার মহিমা চরাচর ব্যাপ্ত।"

"হে আল্লাহ্, তুমিই সকল প্রশংসার পাত্র, হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।"

সমস্ত প্রার্থনা, সমস্ত উপাসনা, যাহা বাক্য দ্বারা, কার্য্য দ্বারা এবং ধন-সম্পদ্ দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে, তৎসমস্ত একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। হে মহানবী, শান্তি তোমাতেই অব্যাহত হউক, আল্লাহ্‌র করুণা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক। শান্তি আমাদিগের উপর আর আল্লাহ্‌র সত্যপরায়ণ পরিচারকগণের উপর অব্যাহত হউক। আমিই সাক্ষী দিতেছি একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন পরিচর্য্যা করিবার আর কেহ নাই। এবং আমিই সাক্ষী দিতেছি যে মোহাম্মদ তাঁহার পরিচারক ও রছুল।"

"হে আল্লাহ্, হজরত মোহাম্মদ আর তাঁহার সহচরবৃন্দকে প্রশংসার পাত্র কর, যেমন তুমি আব্রাহাম এবং তাঁহার সহচরবৃন্দকে প্রশংসার পাত্র করিয়াছিলে এবং নিশ্চয়ই তুমি সর্ব্বোচ্চ প্রশংসার পাত্র এবং সর্ব্বত্র গরীয়ান্। হে আল্লাহ্, তুমি হজরত মোহাম্মদ এবং তাঁহার সহচর বৃন্দকে আশীর্ব্বাদ কর যেমন তুমি আব্রাহাম এবং তাঁহার সহচর বৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে এবং নিশ্চয়ই তুমি সর্ব্বোচ্চ প্রশংসার পাত্র এবং সর্ব্বত্র গরীয়ান।"

হে-আমার প্রভু, আমি আর আমার সন্তান-সন্ততিগণ যেন তোমার প্রার্থনা করিতে পারে। হে আমাদের প্রভু, আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। হে আমাদের প্রভু, যখন আমাদের বিচারের দিন উপস্থিত হইবে, সেই সময় আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসিগণকে তুমি আশ্রয় দিয়ো।

হে আল্লাহ্, আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি, এবং তোমার আশ্রয় যাচ্ঞা করি, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তোমাতেই নির্ভর করি। অশেষ প্রকারে তোমার প্রশংসা করি এবং তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আমরা তোমার নিকট অকৃতজ্ঞ নই, যাহারা তোমার অবাধ্য, আমরা তাহাদিগকে দূরে পরিহার করি, এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি হে আল্লাহ্, আমরা তোমারই পরিচর্য্যা করি, তোমারই প্রার্থনা করি এবং তোমারই আজ্ঞা পালন করি। আমরা তোমার দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হই, আমরা তৎপর হই, এবং তোমার দয়া পাইতে আশা করি, তোমার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি অবিশ্বাসিগণ গ্রহণ করিবে।

এই সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভরা বাক্যাবলি দ্বারা মুছলমানদিগকে প্রত্যহ পাঁচবার তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মনিবেদন করিতে হয়। "হে কম্বলাবৃত মহাপুরুষ, রজনীর অর্দ্ধাংশ বা উহার কিঞ্চিৎ ন্যূন সময় উপাসনায় রত থাক।" ৭৩ঃ১ বিশ্ব-স্রষ্টার নিকট বিশ্বমানবের কিরূপে, কি ভাবে প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন করিতে হয় (প্রত্যেক মুছলমানের করাও উচিত) তাহা বিশ্বের প্রভু মহান্ আল্লাহ্ তাঁহার পরম-ভক্ত মহামানব মোহাম্মদের (দঃ) দ্বারা অতি সুন্দর-ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। মহানবীর প্রাণের অভিব্যক্তি—এই সমস্ত অমৃত-নিস্যন্দিনী বাক্যাবলি, যাহা তাঁহার প্রফুল্ল মুখাম্বুজ হইতে নিঃসৃত

হইয়াছে, তাহার সহিত জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর প্রার্থনা তুলনা করিয়া দেখিলে কে অস্বীকার করিবে যে ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে ইহা প্রকৃতই অতুলনীয়। মুছলমানের প্রার্থনার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মিবে যে, সেই মহামহিমান্বিত বিশ্বনাথের মহিমা ও তাঁহার অসীম গরিমা প্রকাশের জন্য ইহার অনুরূপ প্রার্থনার প্রণালী ও শব্দ-বিন্যাস আজ পর্য্যন্ত কেহই শিক্ষা দিতে, কি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই! সকল পবিত্রতার আধার তাঁহার পবিত্রতা, সকল সদ্‌গুণের আধার তাঁহার গুণাবলী আর মানব-হৃদয়ের প্রীতি ও প্রেমোচ্ছ্বাস—কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হইবে, এমন হৃদয়হীন কে আছে? এক দিকে মন্ত্রোচ্চারণ আর অমৃতহ্রদে অবগাহন, ওগো সুন্দর, ওগো মধুর, আমার যে সব তুমি, তুমি আমার, আমি তোমার, আর ত আমার কিছুই নাই! আমার প্রাণ তুমি, ধ্যান তুমি, তুমি সর্ব্বস্ব ধন! এস হে বাঞ্ছিত, হে চির আকাঙ্ক্ষিত, এস, সত্য সরল সুন্দর! তোমার মহিমাগানে আমার প্রাণ পূর্ণ, হৃদয় আমার তৃপ্ত, অন্তর আমার আলোকিত! এমন করিয়া কে আবাহন করিতে পারিয়াছে, কে আনুগত্য করিতে পারিয়াছে, ভক্তির বন্যায় সমস্ত বিশ্ব—কে এমন করিয়া ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছে? মুছলমানের জীবনের আদর্শ, মুছলমানের প্রাণের ভক্তি, মুছলমানের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধন্য মহানবী, ধন্য তুমি, অন্ধকার দূর করিয়া জগতের বক্ষে যে আলোক দীপ্ত করিয়া গিয়াছ, এমন কে শক্তিমান আছে যে সে আলোক নির্ব্বাপিত করিতে পারে।

এই এছলামের প্রার্থনা, যাঁহার ধর্ম্মভাষা আরবী সাহিত্যে জ্ঞান নাই, যিনি মূল আরবী শব্দ কেবলমাত্র আবৃত্তি করেন, অর্থবোধ

করিতে সক্ষম হন না, তিনি যদি তাঁহার ভক্তিভরা চিত্তে আমাদের অনুবাদিত প্রার্থনার ভাবার্থ উপাসনাকালে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহার অন্তরের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অপবিত্রতা দূর হইবে, নিশ্চয়ই তিনি সে অন্তরে নির্ম্মল শান্তি উপভোগ করিতে পারিবেন।

এছলামের এই প্রার্থনায় তিনটি মহৎ ভাব প্রকাশ পাইতেছে—একটি উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞান, দ্বিতীয়টি সাধনা আর তৃতীয়টি কামনা।

সম্বন্ধজ্ঞান—মহান্ আল্লাহ্ আমাদেব প্রতিপালক (রব শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া আমরা তাহা বুঝাইয়া দিব) কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতার যেমন দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য আছে, তিনি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন না অথচ তিনিই আমাদের প্রতিপালক। (১) মুছলমানের প্রার্থনা—অলস কর্ম্মহীন যেমন কবিয়া থাকে হে প্রভু, তুমি আমাদের রুটি দাও, মুছলমান তাহা কখনও করিবে না; মুছলমান প্রার্থনা করিবে, "হে দুনিয়ার মালেক, তুমি আমাকে কর্ম্মশক্তি দাও, যে শক্তি দ্বারা আমি যেন আমার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে পারি।" মুছলমান ও খৃষ্টানের প্রার্থনার বিভিন্নতা এই—একজন শ্রমবিমুখ জড় প্রকৃতি তাঁহার নিকট অলসভাবে প্রার্থনা করিতেছে, "হে প্রভু, তুমি আমাকে রুটি দাও", আর একজন বলিতেছে, "হে প্রভু, তুমি আমাকে কর্ম্মশক্তি দাও, যে শক্তি প্রয়োগে আমি আমার রুটি আহরণ করিতে পারি।"

---

(১) সেইজন্য মুছলমানগণ তাঁহাকে আব অর্থাৎ পিতা না বলিয়া রব অর্থাৎ প্রতিপালক বলিয়া সম্বোধন করিতে আদিষ্ট হইয়াছে; ইহাতে প্রতিপালকের প্রতি প্রতিপালিতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাধনা—হে প্রভু, তুমি আমাকে সত্য পথে, সরল পথে, ধর্ম্ম পথে পরিচালিত কর, আমি যেন কখন কুপথে না পদার্পণ করি। মুছলমানের হৃদয়ের উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইতেছে, প্রথম হইতেই তাহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

কামনা—তোমার কর্ম্ম করিতে আমাকে শক্তি দাও, আমাকে সাহস দাও, অর্থাৎ যে শক্তির সম্যক্ পরিচালনায় আমি বিশ্বমানবের মঙ্গল সাধন কবিতে পাবি। মানব-জীবনে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহার অপেক্ষা উচ্চ কামনা আর কি হইতে পারে।

অর রহমান এবং অর রহিম—মহান আল্লাহ্র অসংখ্য নাম, তন্মধ্যে কোরআনে বর্ণিত একোনশত গুণবাচক নামেব সংক্ষিপ্ত এই দুইটি নাম রহমান ও রহিম। পবিত্র কোরআনের একটি ব্যতীত সকল পরিচ্ছেদের শিরোদেশে এই দুইটি নাম শোভা পাইতেছে। এই দুইটি পবিত্র বাক্যের অর্থ জগতের সমস্ত মানবকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, মানব তাহার ইহ জীবনে ও পর জীবনে যেন উপলব্ধি করিতে পারে যে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, করুণা ও অসীম প্রেম সমস্ত দিবি ও সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত এবং মানব তাহার প্রত্যেক বাক্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে যেন সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার গুণাবলি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান ও ধারণা করিতে পারে। যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব হারিয়ে অর্থাৎ তাহার সমস্ত সত্তা তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া আত্মানন্দ লাভ করিতে পারে; তাহার মুক্ত বক্ষ হইতে প্রেমের ধারা নির্গত হইয়া সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিবে, সে তখন সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে করুণাময়েরও প্রেমের ধারা তাহার মুক্ত বক্ষে অবিরত ঝরিয়া পড়িতেছে। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রশস্ত বক্ষে এই প্রেমের ধারা স্বর্গ হইতে অবিরল পতিত হইয়াছিল আর তাঁহার মুক্ত বক্ষ

হইতে সেই ধারা নিঃসৃত হইয়া বিশ্ব মানবকে প্লাবিত করিয়াছিল। তাই বিশ্বের করুণাস্বরূপ মহাপ্রাণ মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছিলেন "তাখলকু বে আখলা কেল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণরাজির অনুরূপ নিজের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা কর।

অর রহমান, অর রহিম—এই দুইটী বাক্যের ভিতর কি তত্ত্বজ্ঞান নিহিত আছে, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং আমাদের জ্ঞানও সঙ্কীর্ণ, সুতরাং তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে অক্ষম। প্রথমোক্ত বাক্যে তাঁহার করুণার সম্যক্ বিকাশ, এত করুণা যেমন অনন্ত সাগর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত; তাঁহার করুণার সীমা নাই, শেষ নাই, তাহা অসীম অনন্ত। মানব তাঁহার করুণার অভিব্যক্তি, তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিপলে, এমন কি প্রতি পদক্ষেপে মানব তাঁহার করুণায় রক্ষিত, মানবের মস্তকে তাহা শত ধারে, সহস্র ধারে নিত্য বর্ষিত। তাঁহার এই করুণার ধারা যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিহত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগত স্তম্ভিত হয়, সৃষ্টি-ব্যাপার অচল হইয়া যায়। এই স্বতঃ উচ্ছ্বসিত, জগত প্লাবিত তাঁহার করুণা, তাহার সৃষ্ট জীবের প্রতি অপূর্ব্ব আকর্ষণ, তাঁহার অনন্ত প্রেম, অসীম প্রীতি পবিত্র কোরআনে প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি ছত্রে, প্রতি অক্ষরে, অভিব্যক্ত। তিনি রহিম অর্থাৎ এমন করুণাময় প্রতিপালক প্রভু কে আছেন যিনি আমাদের একগুণ কর্ম্মের শতগুণ পুরস্কার, এতটুকু পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তে বিরাট প্রতিদান, কে এমনভাবে দিতে পারেন?

তিনি **রব**—তাঁহার সৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুর পরিপুষ্টিসাধন, প্রতি স্তরে স্তরে তাহাদের ক্রম-বিকাশ, সর্ব্বশেষে পূর্ণ বিকাশ,—রব এই বাক্য দ্বারা সূচিত হইতেছে আর এই বাক্য দ্বারাই তাঁহার সমস্ত

গুণাবলি পবিত্র কোরআনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত। চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাহাদের পালনকর্ত্তা তিনি—সেই অদ্বিতীয়, করুণাময় আল্লাহ্, রব এই বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির পরিপুষ্টি সাধনোপযোগী সমস্ত উপাদান তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি আমাদের জ্ঞানাতীত হইলেও তাঁহার এই গভীর জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া আমাদিগের জীবনান্ত কাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভাষান্তরিত করিতে রব এই শব্দের প্রতিশব্দ অন্য কোন অভিধানে দৃষ্ট হইবে না, সেইজন্য আমরা তাঁহাকে প্রতিপালক প্রভু, সমস্ত বিশ্বের, স্বর্গের, চরাচর সমস্ত প্রাণীর প্রতিপালক প্রভু বলিয়া অভিহিত করিলাম।

মালেক ও মালিক—এই দুইটি শব্দ এক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও দুইটি বিভিন্ন শব্দ। মালেক শব্দটির দ্বারা তাঁহাকে মনিব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং শেষোক্ত শব্দটির দ্বারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই গৃহীত মালেক শব্দ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, আল্লাহ্ কখন অবিচার করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইতে পারেন না, যদি তিনি তাঁহার কোন সেবককে ক্ষমা করেন, তিনি মালেক অর্থাৎ মনিব তাহা করিতে পারেন, কারণ তিনি কেবলমাত্র রাজা কি বিচারক নহেন, তিনি মনিব অর্থাৎ প্রভু। ইয়াওমেদ্দিন শব্দের অর্থ কোন এক সময় অথচ কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময় নহে অর্থাৎ তাঁহার বিচার-প্রণালী, তাঁহার শাসন-প্রণালী সদা সর্ব্বক্ষণ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। কখন কোন মুহূর্ত্তে কাহার বিচারের সময় উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া আমরা যেন তাঁহারই শরণাপন্ন হই এবং তাঁহার কার্য্যে অর্থাৎ জন-হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি।

প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে যাহাদিগের মস্তকে তাঁহার ক্রোধ নিপতিত হইয়াছে, তাহারা ইহুদী এবং যাহারা কুপথগামী অর্থাৎ ন্যায়পথভ্রষ্ট, তাহারা খৃষ্টান। একজন ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টাকে ঘৃণা সহকারে পরিত্যাগ করায় ইহুদীগণকে অত্যন্ত ঘৃণাশীল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঐরূপ একজন ধর্ম্মোপদেষ্টাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করাতে খৃষ্টানদিগকে ন্যায়পথভ্রষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু মুছলমানদিগকে শিক্ষিত করা হইয়াছে তাহারা যেন আল্লাহ্‌র নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, কখন যেন তাহারা ন্যায়পথভ্রষ্ট না হয়, শত প্রলোভনেও কেহ যেন তাহাদিগকে অসৎপথে চালিত করিতে না পারে।

মুছলমানের নমাজের বা উপাসনার তিনটি স্বতন্ত্র বিধি বা নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য। প্রথম তাহার প্রার্থনায় তাহার প্রার্থিত বস্তুর তারতম্য ভেদে তাঁহাকে সেইরূপ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার নিকট তাহার আবেদন পেশ করিতে হইবে; যেমন কোন বাদীর ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচারের জন্য ফৌজদারী হাকিমের নিকট এবং দেওয়ানী সংক্রান্ত বিচারের জন্য দেওয়ানী হাকিমের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হয়। আবেদনকারীর দ্বিতীয় অবস্থা তাহার প্রার্থিত বিষয়ে তাহার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য তাহাকে তদুপযুক্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে হয়। তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হইলে সে তখন তাহার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বিচারপতির ন্যায় বিচারের উপর আত্মনির্ভর করিতে হয়। এই প্রকারে তিনটী অবস্থা ছুরা ফাতে-হাতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে সম্বোধন করি, "হে প্রভু, তুমিই আমাদের রব, তুমিই রহমান, তুমিই রহিম আর তুমিই মালেকে-ইয়াওমেদ্দিন।" তাহার পর আমরা তাঁহাকে আমাদের দক্ষতা

এবং তদনুযায়ী আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রকাশ করিয়া আমরা প্রার্থনা করি, "হে প্রভু, তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য, তোমার সমীপে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই নিবেদন করিতেছি।"

বস্তুতঃ এই তিনটি বিধি-ব্যবস্থা সম্যক্ প্রতিপালন না করিলে আমরা কখনই আমাদের আবেদন তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, করিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের তাঁহাকে রব বলিয়া অর্থাৎ সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলিয়া সম্বোধন করাই সুসঙ্গত, কারণ আমাদের প্রার্থিত বস্তু লাভ করিবার বিপুল আনন্দ তাঁহাব নামের সহিত যেন একসূত্রে গ্রথিত। আমরা তাঁহাকে রহমান বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া থাকি যে আমাদের এই আনন্দ লাভেব সমস্ত উপাদান ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে রহিম বলিয়া সম্বোধন করিয়া আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে তাঁহার করুণাব নিদানভূত আমাদিগকে তিনি যে শক্তি ও যে প্রতিভা দান করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ প্রকারে বিকসিত করিতে আমরা যেন আমাদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করি আর তিনি পরম কৃপানিধান ও প্রেমময় বলিয়া আমরা যেন তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, কারণ সেই প্রেমিক-প্রবর করুণাময় বিভু আমাদের অর্জ্জিত এতটুকু সৎকর্ম্মের প্রতিদান স্বরূপ আমাদিগকে ইহ ও পরকালে অসীম পুরস্কাব প্রদান করিয়া থাকেন। তৎপরে আমরা যখন তাঁহাকে সম্বোধন করি "হে মালেকে-ইয়াওমেদ্দিন" অর্থাৎ আমাদের জীবনের পরপারের একমাত্র বিচারকর্ত্তা, আমরা তখন মুক্তপ্রাণে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে তাঁহার প্রদত্ত আমাদের শক্তি ও আমাদের প্রতিভা আমরা সুপথে কি কুপথে চালিত করিয়াছি, আর তখনই সেই সূক্ষ্ম বিচারপতি, সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণ আমাদিগকে আমাদের কর্ম্মানুযায়ী

শাস্তি কি পুরস্কার প্রদান করেন। এছলামের শিক্ষার এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যে মানব তাহার অহং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট সর্ব্বদা আবেদন করিবে ঃ—

গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
—বিদ্যাপতি।

মানব যে কোন কর্ম্ম করিবে, কর্ম্মফল অবশ্যই আছে, এখানে আসক্তি ও রাগ দ্বেষ শূন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া করিতে হইবে। সাংসারিক জীবনে পুত্র কলত্র এবং পরিজনবর্গের প্রতিপালনের জন্য কর্ম্ম করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু সাধুলোকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে "আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্যই কর্ম্ম করিতেছি," এখানে কর্ত্তব্যই আমাকে কর্ম্মে চালিত করিতেছে।

কর্ম্মের প্রকৃত মহিমা, কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রার্থনার নিষ্কাম ও সকামভাব, সফলতা ও নিষ্ফলতা পবিত্র কোরআনে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"তোমরা কি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়াছ যে ধর্ম্মের সম্বন্ধে অনৃতবাদ প্রচার করিয়া থাকে? ইহা আর কেহ নহে, কেবল সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন অনাথকে নির্য্যাতিত করে, যে দুঃখিগণকে খাদ্য বিতরণ করিতে উৎসাহিত না করে। তাহার উপাসনা তাহার দৈন্যের কারণ হইবে, যে ব্যক্তি তাহার উপাসনায় তাহার চিত্ত সংযত করিতে পারে নাই। যে ব্যক্তি উপাসনা বা সৎকর্ম্ম করিয়া তাহা লোক-সমাজে

প্রচার করে এবং অভাবগ্রস্তকে দান না করে, তাহার উপাসনা বিফল।” ১০৭ঃ ১—৭

এই শ্লোকের ভাবার্থ—মানব তাহার কর্ম্মশক্তিকে কোন্ পথে চালিত করিয়া করুণাময় আল্লাহ্‌র কৃপার পাত্র হইতে পারে? কর্ম্ম-শক্তি সম্যক্ প্রয়োগ এবং তাহার মূল তত্ত্ব—তাঁহারই সৃষ্ট জীবের কল্যাণ সাধন উপরি উক্ত শ্লোকে এই ভাব অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে দান, তাহা যদি সংবাদ পত্রে প্রশংসিত হইয়া প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে দাতা মনে করিবেন তিনি দানের ফল লাভ করিতে পারিলেন না।

পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, “আল্লাহ্‌র পথে যাহা তুমি ব্যয় করিবে, তুমি তাহার সম্পূর্ণ প্রতিদান পাইবে এবং তোমার প্রতি কোন রূপ অবিচার করা হইবে না।” ৮ঃ ৬০ “যাহারা স্বর্ণ এবং রজতসমূহ সঞ্চিত করিয়া স্তূপীকৃত করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতেছে না, ঘোষণা কর, তাহারা যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি ভোগ করিবে।” ৯ঃ ৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ গীতা ১৭ঃ ২০

“যোগ্য পাত্র বুঝিয়া, প্রতিদান পাইবার আশা না করিয়া, দেশ কাল ও পাত্র দেখিয়া যে দান, তাহাকেই সাত্ত্বিক দান বলা হয়।” মহানবী শিক্ষায় মুছলমানগণ তাঁহাদের নৈতিক জীবনে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, পবিত্র কোরআনে বহু শ্লোকে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে পার্থিব ধন-সম্পদ্ অপেক্ষা পারমার্থিক ধন-সম্পদ্ তাঁহাদিগের কিরূপ প্রিয় বস্তু ছিল, তাহাও পবিত্র কোরআনে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে “ইহজীবনের ধনৈশ্বর্য্য পরবর্ত্তী জীবনের ধনৈশ্বর্য্যের তুলনায় অতি তুচ্ছ।” ৯ঃ ৩৮

আরবা ভূহাত বাক্য "ই আনাত" এবং "ইমদাদ" এই দুইটি বাক্যের পার্থক্য সহজেই বোধগম্য হইবে। একটি বাক্যের অর্থ—আমাদের অভাব পূরণ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ, অপরটি আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরো অধিক পাইবার আকাঙ্ক্ষা। মুছলমানের প্রার্থনায় তাহাকে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে, "হে প্রভু, তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু তাহার মধ্যে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক, বাধা, বা অভাব আছে, তুমি করুণা প্রকাশ করিয়া তাহা দূর করিয়া দাও, আমার এই অভাবটুকু পূরণ করিয়া দাও।" তিনি তাহাকে যে কর্ম্ম-শক্তি, যে প্রতিভা দান করিয়াছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা। সম্যক্ প্রয়োগ না করিয়া আবার তাঁহার কাছে দাবী করিবার তাহার কি অধিকার আছে? অভাবের সহিত সংঘর্ষ করিয়া যদি তাহার কর্ম্ম-শক্তি জয়শ্রী-মণ্ডিতা হয়, তাহা হইলে সে তাঁহার নিকট পুনরায় অগ্রসর হইবার অধিকার পাইবে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চয়ই আমরা মানবকে বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" ৯ঃ৪ প্রকৃতই মানবের দীর্ঘজীবনব্যাপী বিপদের সহিত সংঘর্ষ আর এই সংঘর্ষের ফল, তাহার ক্রম বিকাশ, অবশেষে তাহার পূর্ণ বিকাশ; তাহার কর্ম্ম-শক্তি ও তাহার প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া তাহাকে সংসারে এবং সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ করিয়া থাকে। পবিত্র কোরআনে পুনরায় উক্ত হইয়াছে, "হে মানব, তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে না পার।" ৮৪ঃ৬ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ অর্থাৎ তাঁহার সান্নিধ্য সুখভোগ, ইহাই মানবজীবনের সংঘর্ষের পরিণতি। আল্লাহ্-ভক্ত মহামানব তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সেই মঙ্গলময় মহাপ্রভুর সহিত পরিণদ্ধ হইয়া যে অমৃত পান করিয়াছিলেন, তাহাতেই

এই পৃথিবীর বক্ষে চিরদিন তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। সত্য চির-মঙ্গলময়, চির সুন্দর, সেই সত্যপরায়ণ মহামানবের পুণ্যস্মৃতি, হে আল্লাহ্, আমরা যেন চিরদিন বক্ষে ধারণ করিতে পারি।

ইহার পর মুছলমানকে প্রার্থনা করিতে হইবে, "হে প্রভু, তুমি আমাকে ন্যায় পথ, সত্যপথ প্রদর্শন কর।" আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, আমরা ইতিপূর্ব্বে আত্মোন্নতি করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের যাহা লক্ষ্য অর্থাৎ তোমার সান্নিধ্য সুখভোগ করা, আমাদিগকে সেই লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সত্যপথ প্রদর্শন কর, আর সেই কল্যাণময় পথে চলিবার জন্য আমাদিগকে শক্তি প্রদান কর। আমরা বলিতে পারি না, আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শক্তি আমাদের নাই, মূর্খ আমরা, ভাবাজ্ঞান আমাদের নাই যে তোমার নিকট আত্মনিবেদন করি; কিন্তু হে প্রভু, তুমি আমাদের অন্তরের কথা সবই ত বুঝিতে পারিতেছ, তুমি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দাও। এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিবার সম্বল—আমাদের কর্ম্মফল, কিন্তু তাহার উপর যে তোমার করুণা, কারণ আমরা যদি তোমার দিকে এক পদ অগ্রসর হই, তুমি করুণা করিয়া আমাদের দিকে দশ পদ অগ্রসর হও। হে প্রভু, যদিও তুমি অন্তর্য্যামী, তবুও আমাদের বাসনার দ্বার মুক্ত করিয়া তোমার কাছে নিবেদন করিতেছি, আমাদিগকে সেই পথ দেখাইয়া দাও, যে পথে তোমার অনুগৃহীত মানব পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের উপর তোমার ক্রোধ নিপতিত হইয়াছে কিংবা যাহারা সত্যপথভ্রষ্ট হইয়াছে, হে দয়াময়, যেন আমরা সে পথে চালিত না হই।

মুছলমানের অন্তর ভেদ করিয়া আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইবে সে যেন সত্যপথাশ্রয়ী হইয়া সত্যানন্দ আল্লাহ্‌তে বিলীন হইতে পারে।

তাহার কর্ম্মময় জীবনে সে যেন তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার পর সে তাঁহার প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার বিচারাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে, "হে মালেকে ইয়াওমেদ্দিন, তুমিই বিচার কর, তুমি আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বিচার কর।" পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র বাণী তাহাকে সমস্ত জীবনে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে—"কিন্তু সেই দিনে, যখন সেই কর্ণ-বধিরকারী ধ্বনি উত্থিত হইবে, তখন মানব তাহার পিতা মাতা, দারা-সুত, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া, স্নেহ-মমতার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া যাইবে, সেইদিনে তাহাদের কার্য্যাকার্য্যের পর্য্যালোচনায় তাহাদের সমস্ত সময় অতিবাহিত হইবে। সেইদিনে অনেকের, ফুল্ল-আননে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিবে, অনেকের মলিন মুখ ধূলি-ধূসরিত হইবে। ইহারাই অসৎ এবং অবিশ্বাসী" ৮০: ৩৩—৪২

মুছলমানকে তাহার প্রত্যেক দৈনন্দিন কার্য্যে তাহার শয়নে-স্বপনে, অশনে-গমনে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করিতে হইবে সে সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত সেবক, তাহার সর্ব্বস্ব, তাহার হস্ত-পদ চক্ষু-কর্ণ-সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাহার সমস্ত সত্তার মালেক সেই মহান্ আল্লাহ্‌। এজন্য পবিত্র কোরআনে তাহার প্রতি কি আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

"বল, তিনি আল্লাহ্‌, তিনি এক, আল্লাহ্‌ হইতেছেন এক, যাঁহার উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। তিনি কাহারও প্রজাত নহেন কিংবা কেহ তাহার দ্বারা প্রজাত নহে, (কিন্তু তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা)। তাঁহার সমকক্ষ কিছুই নাই।" ১১২ : ১—৪

পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তকে শের্ক এই শব্দ দ্বারা বিশ্বাসিগণের বিশ্বাস বদ্ধমূল

করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা (মুছলমান) যেন সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর মহান্ আল্লাহ্‌র একত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সমকক্ষ, কি তাঁহার অনুরূপ বস্তু কি ব্যক্তির অস্তিত্ব মনের মধ্যেও কল্পনা না করে, অন্য কোন বস্তু কি ব্যক্তি তাঁহার তুল্য গুণশালী হইতে পারে, এ বিষয় চিন্তাও না করে, তাঁহার সম্পর্কিত কি তাঁহার আত্মীয় অপর কোন ব্যক্তি আছে, ইহা যেন তাহার মনের কোণেও উদয় না হয়; তিনি যাহা করিতে পারেন, অপর কেহ তাহা করিতে পারে, এ চিন্তা করাও তাহার মহাপাপ।

পবিত্র কোরআনে নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে, মুছলমান তাহার কর্ম্মজীবনে সদা সর্ব্বদা আল্লাহ্‌তে আত্মনিয়োগ করিবে, এই ভাব প্রণোদিত হইয়া তাঁহাতেই চিত্ত নিবেশ করিবে, তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ধ্যানে তাহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিবে।

"বল, আমি সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের অধীশ্বর প্রভু আল্লাহ্‌তে আত্মগোপন করিবার পথ অনুসন্ধান করিতেছি; তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অনুপপত্তি হইতে, তমসাবৃতা রজনীর বিভীষিকা হইতে এবং কলুষিত চিত্ত ব্যক্তিগণের দৃঢ় সংকল্পিত দূষিত প্রস্তাব হইতে এবং বিদ্বেষী লোকের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বিদ্বেষের অনল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য।" ১১৩ঃ ১-৫

"হে সর্ব্ব-মঙ্গলময় প্রভু, ঊষার স্নিগ্ধ আলোকরেখায় রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া যেমন তুমি চরাচর সমস্ত বিশ্ব আলোকিত কর, তেমনি আমাদের পার্থিব জীবনের গাঢ় অন্ধকার হইতে আর আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভীষিকা হইতে তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর।"

নরপতি যেমন তাঁহার প্রজাকে শাস্তি দিবার পূর্ব্বে তাহাকে সতর্ক করিয়া থাকেন, তেমনি বিশ্বপতি তাঁহার সৃষ্ট মানবকে শাস্তি

দিবার পূর্ব্বে সতর্ক করিয়া থাকেন, এ বিষয় পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে।

গুণবান্ ব্যক্তি যেমন বিনয় ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন, আমার আর কি গুণ আছে, মুছলমানও তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তার নিকট সমস্ত অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিবে, "হে প্রভু, আমার আর কি গুণ আছে, তুমি দোষ গণনা করিলে গুণের লেশ মাত্র পাইবে না; কিন্তু তুমি যে জগন্নাথ, সমস্ত জগত তোমার সৃষ্টি, আমিও তোমার সৃষ্টির ভিতরে সেইরূপ একজন, সুতরাং আমি কেননা তোমার দয়া পাইব।" এছলামের অনুশাসনে মুছলমান তাহার আত্মীয় কি অনাত্মীয়, তাহার স্বদেশবাসী কি ভিন্ন দেশবাসী, সকল মানবের নিকট বিনীত ও নম্র, সুতরাং তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট তাহাকে কত দূর বিনীত ও নম্র থাকিতে হইবে, মহাধর্ম্মগ্রন্থ কোরআনে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। মুছলমান জ্ঞানে মৌনী, শক্তিমান হইয়াও ক্ষমাশীল, এবং ত্যাগে নিরহঙ্কার, ইহাই মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নীতি শিক্ষা। উত্তম শ্লোক মহানবী বলিয়াছেন যে ব্যক্তি, শান্ত সংযত, অহিংস্র ও নিরহঙ্কার, সেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং পরবর্ত্তী জীবনে সে আমার নিকট অবস্থিতি করিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি দাম্ভিক, অহঙ্কারী, হিংস্র ও কোপন-স্বভাব, সেই আমার পরম শত্রু এবং আমার নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিবে।

এক্ষণে বিবেচ্য আমাদের যোগ্যতা কিংবা অধিকার—তাঁহার নিকট পুনরায় তাঁহার করুণা লাভ করিবার যোগ্যতা কি অধিকার আমাদের আছে কি? তিনি আমাদের কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা এবং তাহার সাধনোপযোগী যে সমস্ত উপকরণ আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সমাদর করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদি আমরা তাহা করিতে না

পারি, তাহা হইলে আবার আমরা কি প্রকারে প্রার্থনা করিব, হে প্রভু, তুমি আমাদিগকে আবার দাও। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে শিক্ষা দিতেছে, "অকৃতজ্ঞ কাফেরগণের প্রার্থনা তাহাদিগকে কুপথে চালিত করিবে।" তোমার কর্ম্ম-শক্তিকে চালিত না করিয়া, তাঁহার প্রদত্ত উপকরণাদির সম্যক্ ব্যবহার না করিয়া, তুমি তাঁহার নিকট অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতেছ, সুতরাং তোমার প্রার্থনা তোমাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত না করিয়া তোমার আরো অধঃপতনের কারণ হইতেছে। সুতরাং তোমার কল্পিত প্রার্থনা তোমার কর্ম্মশক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে কুফল প্রদান করিবে, তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়কে অচল করিয়া তোমার কর্ম্মশক্তিকে খর্ব্ব করার জন্য নিশ্চয়ই তুমি কলুষভাগী হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃস উচ্যতে।" গীতা, ৩।৬

"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় বন্ধ করে কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনে মনে চিন্তা করে,—সেই মূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।"

গান্ধী ভাষ্য—যেমন যে ব্যক্তি বাক্য রোধ করে কিন্তু মনে মনে কাহাকেও গালি দেয়, সে কেবলমাত্র নিষ্কর্ম্মা নয়, পরন্তু মিথ্যাচারী। ইহার অর্থ এমন নয় যে মন যদি রোধ না করা যায়, তবে শরীর রোধ করা নিরর্থক। শরীরকে রোধ না করিলে মনের উপর কর্তৃত্ব আসেই না, কিন্তু শরীরকে রোধ করার সহিত মনকে রুদ্ধ করিবার যত্ন থাকা চাই। যে ব্যক্তি ভয় বা বাহ্য কারণের জন্য শরীরকে রোধ করে, কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, কেবল ইহাই নয়, মন দ্বারা বিষয় ভোগ করে, আর যদি সুবিধা পায় ত শরীর দ্বারাও ভোগ করে, সেই প্রকার মিথ্যাচারীকে এই স্থানে নিন্দা করা হইয়াছে। অনেক হিন্দু ও মুছল-

মান দেবমন্দিরে কি মছজেদে যাইয়া প্রার্থনা করেন "হে পরমেশ্বর আমি তোমায় পূজা দিব, পীরের সিরণি দিব, আমার অমুক শত্রু, তাহার উচ্ছেদ কর, তাহার বিরুদ্ধে আমি যেন মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারি।" ঈশ্বর তাহার প্রার্থনাকারীর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিবেন। আমার কর্ম্মশক্তি দ্বারা আমি জয়শ্রী মণ্ডিত হইতে পারি, আমার কর্ম্মশক্তি দ্বারা আমি সাফল্য লাভ করিতে পারি, তাহা না করিয়া আমি তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন "ঘুষখোর" আমার নিকট হইতে ঘুষ লইয়া আমাকে সাহায্য করিবেন! ইহাই কাফেরের প্রার্থনা।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ গীতা ৩ঃ৮

তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা অধিকতর ভাল, তোমার শরীরের ব্যাপারেও কর্ম্ম বিনা চলে না।

গান্ধী ভাষ্য—মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিয়মে রাখিয়া সঙ্গ রহিত অর্থাৎ কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং সৎসঙ্গে অবস্থিতি করিয়া কর্ম্ম করিবে। এখানে নিয়ত কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল নিয়মে রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতেই করার অনুরোধ নিহিত আছে।

কিরূপ কর্ম্ম এবং কি প্রকারে কর্ম্ম করিতে হইবে।

নিয়তং সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎতৎ সাত্বিকমুচ্যতে। ১৮ঃ২৩

ফলেচ্ছা রহিত (ফলেচ্ছা ঈশ্বরে অর্পিত) পুরুষ দ্বারা আসক্তি ও রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কৃত নিয়ত কর্ম্মকে সাত্বিক কর্ম্ম বলে।

সেই দিনে শাস্তি যখন তাহাদের উর্দ্ধ দিক হইতে, তাহাদের অধোদেশ হইতে তাহাদিগকে আবৃত করিবে, তখন মহান্ আল্লাহ্

তাহাদিগকে বলিবেন, "এখন তোমরা তোমাদের কর্ম্মফল ভোগ কর। কিন্তু হে আমার বিশ্বাসী সেবকগণ, আমার সৃষ্টজগত অতি বৃহৎ, তোমরা কেবলমাত্র আমারই পরিচর্য্যা করিবে; প্রত্যেক আত্মা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তাহার পর আমার নিকট আনীত হইবে, এবং যাহারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মপরায়ণ, আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সেই উদ্যানে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিব, যেখানে তটিনী মৃদুমন্দে প্রবাহিত, সেই স্থানেই তাহারা অবস্থিতি করিবে।" ২৯ঃ ৫৫-৫৮

সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের পুরস্কার (মহান্ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত) কত সুন্দর। পবিত্র কোরআনে সর্ব্বস্থানে এই পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া মুছলমানকে পাপের পথ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। "যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে আর তাহাদের প্রভুর নিকট বিনীত থাকে, তাহারাই সেই উদ্যানের বাসিন্দা।" ১১ঃ ২৩

পবিত্র কোরআনে মানবকে সতর্ক করিতে পুনরায় উক্ত হইয়াছে- "এবং সেই বিচারের দিনে তুমি দেখিতে পাইবে যাহারা সেই মহান্ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অনৃতবাণী প্রচারিত করিয়াছে, তাহাদের মুখশ্রী আতঙ্কে মসিলিপ্ত হইবে। অহঙ্কারিগণের বাসস্থান কি নরকে নির্ম্মিত হয় নাই? যাহারা তাহাদের কর্ম্ম-শক্তিকে সৎপথে চালিত করিবে এবং পাপ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। আত্মম্ভরিতা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, আর তাহাদিগকে বিলাপ করিতে হইবে না।" ৩৯ঃ ৬০, ৬১

সমস্ত মুছলমানকে জয়শ্রী মণ্ডিত করিয়া রাখিতে সেই মহামানবের প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হইতে যে পীযূষপূর্ণ সত্যবাণী নির্গত হইয়াছে, তাহা অনুপমেয়, অতুলনীয়, তাহা সরল, সুন্দর, মধুর এবং মর্ম্মগ্রাহী। শান্ত, সংযত, স্থির, অকম্পিত তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণকে সেই মহিমান্বিত

মহেশ্বরের মহান্ ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি তাহাদিগকে যে সুযোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন দেশে ঈশ্বরভাবাবিষ্ট কোন মহাপুরুষ তাঁহার দেশবাসীকে এরূপ সুযোগ দিতে পারেন নাই। সেই মহান্ আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত মুছলমানগণ ধর্ম্ম-জগতে তাঁহাদের সিংহাসন সকলের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্ম-শক্তিকে কর্ত্তব্যের পথে চালিত করিয়া তাঁহারা প্রায় সকল জাতির উপর তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহাদের কি অধঃপতন, আজ তাঁহারা এছলামের সেই জ্ঞান ধর্ম্ম পুণ্য কাহিনী মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া কর্ত্তব্যবিমুখ অলস জীবন যাপন করিতেছেন। প্রাচীন যুগের সেই সমস্ত মহাপ্রাণ মুছলমানগণ আল্লাহ্‌র উপর একান্ত নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায়পরায়ণতায়, তেজস্বিতায় এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁহারা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া প্রায় সমস্ত দেশে তাঁহাদের বিজয় পতাকা উড়াইতে পারিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ যেন মোহগ্রস্তের মত খৃষ্টানদিগের পথ ধরিয়া সেই চিরমঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, "হে প্রভু, তুমি আমাদিগকে আমাদের জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য দ্রব্য দান কর।" শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, তেজ নাই, দৃঢ়তা নাই, যেন অবসাদগ্রস্ত জীবনটাকে একটানা ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। নব জীবনের প্রদীপ্ত অনুরাগ, বালার্কসদৃশ তেজদীপ্তি, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত জ্ঞানের বিকাশ, যাঁহাদের জীবনের সমস্ত সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল এবং যাঁহাদের এক সময়ের প্রার্থনা ছিল, "হে প্রভু, তুমি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিতে পারি, আজ তাঁহাদের পন্থানুসরণ-কারিগণ কাতরভাবে নিবেদন করিতেছে, হে প্রভু, তুমি আমাদিগকে

চালিত কর, আমাদের কর্ম্মশক্তি অচল।" এখন মুছলমান শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরানুগ্রহজীবী। মুছলমানের সে' অনুপ্রেরণা, উদ্দাম বাসনার অপ্রতিহত গতি আর নাই, এখন সেই কর্ম্ম-শক্তির স্রোত আলস্য ও জড়তায় প্রতিহত। মুছলমান, হৃদয়ের যা কিছু মলিনত্ব জ্ঞানের দীপ্ত আলোক-শিখায় ভস্মীভূত কর, মুছলমান তুমি জেগে উঠ, শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ শিরদেশে ধারণ করিয়া উন্নত শিরে অনন্ত শূন্যে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বল, তুমি শান্তির দূত মহান্ আল্লাহ্‌র প্রেরিত, অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার (পবিত্র কোরআন) তোমার করতলগত, নিঃস্বার্থভাবে জগতের লোককে সেই মহামূল্য রত্নরাজি (কোরআনের পবিত্র বাণী) বিতরণ কর, আবার শান্তির স্রোত জগতের বক্ষে প্রবাহিত হ'ক্, অশান্তির সমস্ত অনল শিখা নির্ব্বাপিত হ'ক্।

এখনকার দিনে সার্ব্বজনীন উপাসনায় অধিকাংশ মুছলমান কেবল-মাত্র আবৃত্তি করিয়া উপাসনার কর্ত্তব্য শেষ করেন, শব্দের অর্থ ও প্রার্থনার ভাব অন্তরে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, আগ্রহ নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র লোকসমাজে সমাদৃত হইবার জন্য নমাজের কথাগুলি আবৃত্তি করেন এবং পাঁচ ওক্ত (বার) নমাজ আবৃত্তি করেন বলিয়া লোকের প্রশংসার পাত্র হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; কিন্তু যাঁহারা এছলাম প্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সমস্ত মৌলভী, মওলানা মহোদয়গণকে আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন এই সমস্ত নিরক্ষর মুছলমানগণকে নমাজের প্রকৃত অর্থ ও ভাব সরল মাতৃভাষায় বুঝাইয়া দেন। ফাতেহার কি উদার মহৎভাব, এই ভাবের সৌন্দর্য্য যদি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, ইহার প্রকৃত অর্থ যদি বুঝিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এছলামের ভাবে

অনুপ্রাণিত হইবে। মুছলমানের অন্তরে যদি এছলামের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহার অন্তরে যদি বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সহস্র শয়তানের সমবেত চেষ্টা আমাদের দেশের শান্তির স্রোত কখন প্রতিহত করিতে পারিবে না।

অনেক মুছলমান বলিয়া থাকেন আমি অগ্রে ভারতবাসী, তাহার পর মুছলমান, অনেক হিন্দুরও এইরূপ ধারণা। কিন্তু এই দুইটী শব্দ এইরূপ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটীকে বাদ দিলে আর একটী আমাদের অভিধানে লুপ্ত হইবে। যখন আল্লাহ্‌র নাম না লইয়া মানবের কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই, তখন তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন, আমি অগ্রে ভারতবাসী। মুছলমান যখন ফাতেহার ভাব অন্তরে ধারণ না করিয়া, আল্লাহ্‌র নাম না লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে একপদ অগ্রসর হইতে পারেন না, তখন তিনি কখন বলিতে পারেন না, আমি অগ্রে ভারতবাসী। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে উক্ত হইয়াছে, "স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা হে প্রভু, তুমিই আমার ইহজীবনে ও পরজীবনে একমাত্র অভিভাবক, তোমার বশীভূত থাকিয়া আমি যেন মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি এবং আমি যেন সত্যপথাশ্রয়ীর সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারি।" ১২ঃ১০১ হিন্দুগণও কখন বলিতে পারেন না যে, "আমি অগ্রে ভারতবাসী", কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!" হে ভারত, (ভারতবাসী) তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণ লও। সুতরাং তিনি যখন ইহজীবনে একমাত্র অভিভাবক, যখন অভিভাবকের অনুমতি না লইয়া এক-পদ অগ্রসর হইবার অধিকার নেই, তখন মুছলমান কিছুতেই বলিতে পারেন না যে তিনি অগ্রে ভারতবাসী; হিন্দুগণেরও যখন তাঁহার

শরণ না লইয়া কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই, তখন তাঁহারাও বলিতে পারেন না যে তাঁহারা অগ্রে ভারতবাসী। "আল্লাহু নূরোছ-ছামাওয়াতে ওয়াল্‌আরদে" তিনিই যখন স্বর্গ ও পৃথিবীর আলোক, তাঁহার আলোক না পাইলে যখন আমাদিগকে অন্ধকারের গাঢ় আবরণে আচ্ছাদিত থাকিতে হয়, তখন তাঁহাকে বাদ দিয়া অর্থাৎ অন্ধকারাবৃত জীবনে কি করিয়া এত বড় মহৎকার্য্য—দেশের কাজ, তাহাতে অগ্রসর হইতে পারি। মানবের কর্ম্মহীন জীবন কখনও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য সুখলাভ করিতে পারে না, কর্ম্মের সহিত তাঁহার নাম এরূপভাবে সংযুক্ত যে একটীকে বাদ দিয়া অপরটী কখনও লাভ করা যায় না। মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষ দেশের ও দশের জন্য আত্মত্যাগ। জন্মভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বভূতের হিতার্থে আত্ম-নিয়োগ করার মত মহৎকার্য্য মানব জীবনে আর নাই। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিতর আমি নিমগ্ন, যখন তাঁহা হইতে পৃথক্‌ সত্ত্বা কিছুই নাই, আমার তখন কি সাধ্য আমি তাঁহাকে বাদ দিয়া একপদ অগ্রসর হইতে পারি। জগত কর্ম্মময়, কর্ত্তা ঈশ্বর, তুমি আমি উপলক্ষ্য মাত্র। যখন সমস্ত কর্ম্মফল আল্লাহ্‌তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই আদেশে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করিতেছি, যখন অহংজ্ঞান সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই কর্ম্মে নিযুক্ত আছি, তখন তাঁহাকে বাদ দিয়া আমি কি করিয়া বলিব যে, অগ্রে আমি ভারত বাসী। ত্যাগের মন্দিরে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া অর্থাৎ সর্ব্বভূতের হিতার্থে আত্ম-নিয়োগ করা ঈশ্বর-সাধনার নামান্তর মাত্র। হজরত মোহাম্মদের আজীবন সাধনা—মানব সাধারণের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ, তাঁহার দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে সেই মহাপুরুষ আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন,

কিন্তু তিনি তাঁহার দৈনন্দিন প্রত্যেক কার্য্যে করুণাময় আল্লাহ্‌র নাম ভক্তি-আপ্লুতচিত্তে স্মরণ করিয়া তবে সে কার্য্যে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্তলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি সেই মহান্ আল্লাহ্‌র একজন দীনতম সেবক আর জনসেবাই তাঁহার সেবা। এছলামের ইতিহাস পাঠ করিলে আপনাদিগের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে, সেই মহামানব জগতে সর্ব্বপ্রথমে গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমরা তাঁহার পবিত্র জীবনীতে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

এছলামের উপাসনার অনুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, "হে সর্ব্বমঙ্গলময় মহাপ্রভু, তুমি আমাদিগকে এই বিপদসঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পথ দেখাইয়া দাও।" তাহা হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাইব আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী সমস্ত পদার্থ তাঁহারই কৃপায় আমাদের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তখন আমাদের কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা সেই সমস্ত পদার্থ সংগ্রহ করিব। যদি স্বর্গীয় জ্ঞানের দীপ্তি আমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে আমাদের সহজেই বোধগম্য হইবে যে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থই তাঁহার করুণার অভিব্যক্তি। আমরা যেখানেই যাই না কেন, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, প্রান্তরে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইব, তাঁহার করুণার ধারা প্রবাহিত। তখন আমরা ভক্তিভরা চিত্তে তাঁহাকে ডাকিব, "হে প্রভু, তুমি যে আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়াছ, আমরা তোমাকে আমাদের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

"আল্লাহু আকবর" আল্লাহ্ গরীয়ান, মহীয়ান, এছলাম পরম শান্তি, মানবের কামনা—তাঁহার নামে আত্ম-নিয়োগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শান্তি

লাভ করা। মানব যদি আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান, আল্লাহ্‌র ভাবে অনুপ্রাণিত, আল্লাহ্‌র সত্ত্বায় স্থিতিমান, তাহা হইলে এছলামও সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি হিন্দু, মুছলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কেহ একেশ্বরবাদী, যে কেহ তাঁহার গুণে অনুরঞ্জিত, যে কেহ তাঁহার ভারাবিষ্ট, তিনিই এছলামের অন্তর্ভূত। এই খানেই এছলামের বিশ্বজনীনত্ব, আর এই সৌন্দর্য্যে জগৎ আকৃষ্ট।

সমস্ত জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সমূহ আহুরিত হইয়া আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বাণীরূপে পবিত্র কোরআনে রক্ষিত হইয়াছে। জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের সারভাগ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব এই মহা ধর্ম্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। আবার এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পুস্তকের সার মর্ম্মের অভিব্যক্তি—ছুরা ফাতেহা। ছুরা ফাতেহার মধ্যমণি—বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম। অতএব সমস্ত জগতের ব্যক্ত, অব্যক্ত, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূলাধার হইতেছে বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম।

আদি পুরুষ আদমের সময় হইতে আল্লাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট সত্য সনাতন এছলাম ধর্ম্মের জয় সহস্র কণ্ঠে ঘোষিত হউক।

করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে সমস্ত পৃথিবী ধ্বনিত হউক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

লীলাবাস
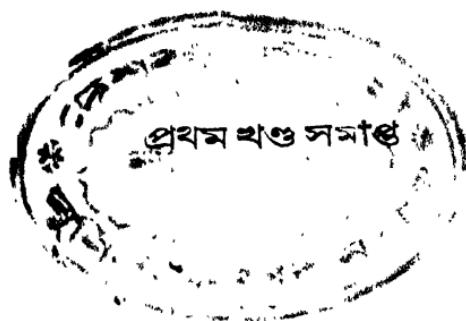
সমাজের মঙ্গল জনক এরূপ উপন্যাস আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় বাহির হয় নাই। হিন্দু সমাজে কিরূপ ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, পল্লী সংস্কার, হিন্দু ও মুছলমানে মিলন গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে উপন্যাসের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না। অধিকাংশ সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

অমৃত বাজার পত্রিকা।— * * * * হিন্দু ও মুছলমান ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য জন সেবা, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ইহাই একমাত্র পথ, গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে উপন্যাসের মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন। লীলা, মোহনলাল ও হানিফের চরিত্র প্রত্যেক মানবের অনুকরণীয়। অত্যাচার পীড়িতা লীলার অকাল মৃত্যুর কাহিনী পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয় ও বিগলিত হয়। আমাদের মতে প্রত্যেক হিন্দু ও মুছলমানের পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মুছলমান পত্রিকা।— * * * * হিন্দু সমাজের কুসংস্কার-গুলি উপন্যাসের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার অতি সাহসিকতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবের শিক্ষার উপযোগী এরূপ উপন্যাস সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমরা প্রত্যেক হিন্দু ও মুছলমানকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

দী-বাতি।— * * * * গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত পবিত্র কোরাণ ও গীতার ভাব উপন্যাসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিক্ষার অনেক জিনিষ এই পুস্তকের ভিতর সন্নিবেশিত হইয়াছে। লীলার অকাল মৃত্যুর কাহিনী পড়িয়া কিছুতেই চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন মোহনলাল, লীলাও হানিফের চরিত্র নিখুঁত, কলঙ্কলেশ হীন।